

ନିଷ୍କତି

ଆଶ୍ୱର ମୁଦ୍ରଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶାବ୍ଦୀ

: ପ୍ରାଣିଜ୍ଞାନ :

କାମିନୀ ପ୍ରକାଶନୀ

୧୧୫, ଅଧିଲ ମିତ୍ର ଲେନ
କଲିକାତା-୯

প্রকাশকঃ
শ্রামাপদ সরকার
১১৫, অধিল মন্ত্রী লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশঃ
মাঘ—১৩৫৯

মুজাকরঃ
অচিন্ত্যকুমার দে
মঙ্গলচন্দ্র প্রিণ্টার্স
৬৭/এ ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

এ ক

ভবানীপুরের চাটুয়েরা একান্নবর্তী পরিবার। দুই সহোদর গিরীশ
ও হরিশ এবং খুড়তো ছোট ভাই রমেশ। পূর্বে ইহাদের পৈতৃক বাটী
ও বিষয়-সম্পত্তি কুপনারায়ননদীর তৌরে হাওড়াজেলার ছোট-বিষ্ণুপুর
গ্রামে ছিল। তখন গিরীশের পিতা ভবানী চাটুয়ের অবস্থাও ভাল
ছিল। কিন্তু, হঠাৎ একসময়ে কুপনারায়ণ এমনি প্রচণ্ড ক্ষুধায় ভবনীর
জমি-জায়গা, পুরু-বাগান গিলিতে শুরু করিলেন যে, বছর পাঁচ-ছয়ের
মধ্যে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট রাখিলেন না। অবশ্যে, সাতপুরুষের
বাস্তুভিটাটি পর্যন্ত গলাধঃকরণ করিয়া এই ব্রাহ্মণকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করিয়া
নিজের ত্রিসীমানা হইতে দূর করিয়া দিলেন। ভবানী সপরিবারে
পলাইয়া আসিয়া ভবানীপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সে-সব অনেক
দিনের কথা। তাহার পর গিরীশ ও হরিশ উভয়েই উকিল হইয়াছেন,
বিস্তর বিষয়-আশয় অর্জন করিয়াছেন, বাটী প্রস্তুত করিয়াছেন—এক
কথায়, যাহা গিয়াছিল তাহার চতুর্থ ফিরাইয়া আনিয়াছেন। এখন
বড়ভাই গিরীশের বাংসরিক আয় চক্রিশ-পঁচিশ হাজার টাকা,
হরিশও পাঁচ-ছয় হাজার টাকা উপায় করেন, শুধু করিতে পারে নাই
রমেশ। তবে একেবারে যে কিছুই পারে নাই তাহা নহে। বার দুই-
তিন সে আইন ফের করিতে পারিয়াছিল এবং সম্প্রতি কি একটা
ব্যবসায়ে বড়দার হাজার তিন-চার লোকসান করিয়া এইবার ঘরে
বসিয়া ধৰের কাগজের সাহায্যে দেশ-উদ্ধারে রত হইয়াছিল।

কিন্তু, এতদিনের এক সংসার এইবার ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম
করিতে লাগিল। তাহার কারণ, মেজবো ও ছোটবোয়ে কিছুতেই আর
বনিবনাও হয় না। হরিশ এককাল কলিকাতায় থাকিতেন না, সপরিবারে
মফস্বলে থাকিয়া প্র্যাকটিশ করিতেন। তখন মাঝে মাঝে দু-দশ দিনের

বাড়ি আসা-বাসার অল্প সময়টুকু এই ছুটি নারীর বিশেষ সন্তাবে না। কাটিলেও কলহ-বিবাদের একপ অচুর অবসর ছিল না। প্রায় মাস-থানেক হইল হরিশ সদরে ফিরিয়া আসিয়া ওকালতি করিতেছেন এবং বাড়ি হইতে শুখশাস্তি ও পলাইবার উপক্রম করিয়াছে। তবে এবার আসিয়া পর্যন্ত হই জায়ের মনকথাকথি ব্যাপার এখনও উচু পর্দায় উঠে নাই; তাহার কারণ ছোটবো এতদিন এখানে ছিল না। রমেশের শ্রী শৈলজা তাহার একমাত্র পুত্র পটল ও সপজ্জী-পুত্র কানাইলালকে বড়জার হাতে রাখিয়া মরণাপন্ন বাপকে দেখিতে কৃষ্ণনগর গিয়াছিল। বাপ আরোগ্য হইয়াছেন, সেও দিন পাঁচ-ছয় ফিরিয়া আসিয়াছে।

বাড়িতে শাশুড়ি এখনও বাঁচিয়া আছেন বটে, কিন্তু বড়বধু সিঙ্কেখরীই যথার্থ গ়হিণী। তাহার প্রকৃতিটা ঠিক বুঝা যাইত না, এইজন্য বোধ করি পাড়ায় তাহার অস্যাতি-মুস্যাতি হই-ই একটু অতিমাত্রায় ছিল।

সিঙ্কেখরীর দরিদ্র পিতামাত্রা তখনও বাঁচিয়া ছিলেন। গত পাঁচ-ছয় বৎসর ধরিয়া তাহারা অবিশ্রাম চেষ্টা করিয়া এবার পূজার সময় মেয়েকে বাড়ি লইয়া গিয়াছিলেন। সিঙ্কেখরী সংসারফেলিয়া বেঙ্গীদিন সেখানে ধাকিতে পারিলেন না, মাসখানেক পরেই ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু কাটোয়ার ম্যালেরিয়া সঙ্গে করিয়া আনিলেন। অথচ, বাড়ি আসিয়া অত্যাচার বন্ধ করিলেন না। তেমনিই প্রাতঃম্বান চলিতে লাগিল এবং কিছুতেই কুইনিন সেবন করিতে সম্মত হইলেন না। অতএব ভুগিতেও লাগিলেন। হই-চারি দিন যায়—জরে পড়েন, আবার উঠেন আবার পড়েন। ফলে, দুর্বল হইয়া পড়িতেছিলেন—এমনি সময়ে শৈল বাপের বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়াকড়ি শুরু করিয়া দিল। ছেলেবেলা হইতে চিরকাল সে বড়বধুর কাছেই আছে, এজন্য সে জোর করিতে পারিত, মেজবো কিংবা আর কেহ তাহা পারিত না। আরও একটা কারণ ছিল। মনে মনে সিঙ্কেখরী তাহাকে ভাবী ভয় করিতেন। শৈল অস্যন্তরাগী মাঝুক

এবং এমনি কঠোর উপবাস করিতে পারিত যে, একবার শুল্ক করিলে কোন উপায়েই তাহাকে জলস্পর্শ করানো শুরুত না—এইটাই সিদ্ধেশ্বরীর সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষার হেতু ছিল।

শৈলের মাসীর বাড়ি পটলডাঙ্গায়। এবার কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়া অবধি তাহাদের সহিত দেখা করিতে পারে নাই। আজ একাদশী, শাশুড়ীর রাম্ভার কাজ করে নাই—তাই সকালেই সিদ্ধেশ্বরীর মেজছেলে হরিচরণের উপর মাকে ওষধ খাওয়াইবার ভাব দিয়া সে পটলডাঙ্গায় গিয়াছিল।

শীতকাল। ঘণ্টা-চাই হইল সক্কা হইয়াছে। কালপ্রভাত হইতেই সিদ্ধেশ্বরীর ভালো করিয়া জ্বর ছাড়ে নাই। আজ এই সময়টায় তিনি লেপ মুড়ি দিয়া চুপ করিয়া নির্জীবের মত তাহার অতি অশস্ত্র শয্যার একাংশে শুইয়া ছিলেন এবং এই শয্যার উপরেই তিনি চারিটি ছেলেমেয়ে চেঁচামেচি করিয়া খেলা করিতেছিল। নীচে কানাইলাল প্রদৌপের আলোকের সম্মুখে বসিয়া ভূগোল মুখস্থ করিতেছিল—অর্থাৎ বই খুলিয়া হাঁ করিয়া ছড়োছড়ি দেখিতেছিল। ওধারে শয্যার উপর হরিচরণ শিয়রে আলো জালিয়া চিত হইয়া নিবিষ্টিচিন্তে বই পড়িতেছিল। বোধ করি পাসের পড়া করিতেছিল, কারণ এত গঙ্গোলও তাহার লেশমাত্র ধৈর্যচূড়ি ঘটিতেছিল না। যে শিশুর দলটি একক্ষণ চেঁচামেচি করিয়া বিছানার উপর খেলিতেছিল ইহারা সকলেই মেজকর্তা হরিশের সন্তান।

বিপিন সহসা সরিয়া আসিয়া সিদ্ধেশ্বরীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, আজ আমার ডানদিকে শোবার পালা, না বড়মা ?

কিন্তু বড়মা জবাব দিবার পূর্বেই নীচে হইতে কানাই ডাক দিয়া বলিল, না বিপিন, তুমি না। বড়মার ডানদিকে আমি শোব যে।

বিপিন প্রতিবাদ করিল, তুমি কাল শুয়েছিলে যে মেজদা ?

কাল শুয়েছিলাম ? আচ্ছা, আচ্ছা, আজ তবে বাঁদিকে।

যেই বলা, অমনি পটলের ক্ষুত্র মন্তক লেপের ভিতর হইতে উচু

হইয়া উঠিল, সে এতক্ষণ প্রাণপথে চুপ করিয়া জ্যাঠাইমার বাঁদিক
ঘেঁষিয়া পড়িয়াছিল। বেদখল হইবার সন্তাননায় অমন হড়োমুড়িতে
পর্যন্ত ঘোগ দিতে ভরসা করে নাই। সে ক্ষীণকর্ত্তে কহিল, আমি
এতক্ষণ চুপ করে শুয়ে আছি !

কানাই অগ্রজের অধিকার লইয়া হস্তার দিয়া উঠিল, পটল ! বড়-
ভাইয়ের সঙ্গে তর্ক করো না বলচি ! মাকে বলে দেব !

পটল বেচারা অভ্যন্ত বেগতিক দেখিয়া এবার জ্যাঠাইমার গলা
জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া নালিশ করিল, বড়মা, আমি কখন
থেকে শুয়ে আছি যে !

কানাই ছোটভায়ের স্পর্ধায় চোখ পাকাইয়া ‘পটল’ বলিয়া
গঞ্জিয়া উঠিয়াই হঠাৎ থামিয়া গেল।

ঠিক এইসময়ে ঘরের বাহিরের বারান্দার একপ্রান্ত হইতে শৈলজাৰ
কষ্টস্বর আসিল, ওরে বাপ রে ! দিদির ঘরে কি ডাকাত পড়েছে !

সঙ্গে সঙ্গে কি পরিবর্তন ! ও-বিছানায় হরিচরণ পাঠ্যপুস্তকটা
ধ' করিয়া বালিশের তলায় গঁজিয়া দিয়া এবার বোধ করি একখানা
অপাঠ্য পুস্তক খুলিয়া বসিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল—চোখে তাহার
অনন্ত মনোযোগ। কানাই বাঁদিক ডানদিকের সমস্যা আপাততঃ
নিষ্পত্তি না করিয়াই চীৎকার জুড়িয়া দিল—‘যে বিস্তীর্ণ জলরাশি—’,
আর সবচেয়ে আশচর্য ওই শিশুর দলটি ! ভোজবাজির মত কোথায়
তাহারা যে একমুহূর্তে অন্তর্ধান হইয়াগেল তাহার চিহ্ন পর্যন্ত রহিলনা।
শৈলজা কলিকাতা হইতে এইমাত্র ফিরিয়া বড়জাৰ জন্য একবাটি গৱম
হৃথ হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঢ়াইল। এখন কানাইলালের
'মহাসমুদ্রের গভীর কল্লোল' ব্যতীত বৰ সম্পূর্ণ স্তৰ। ওদিকে হরিচরণ
এমন পড়াই পড়িতে লাগিল যে, তাহার পিটের উপর দিয়া হাতিচলিয়া
গেলেও সে অক্ষেপ করিত না। কারণ ইতিপূর্বে সে ‘আনলম্ব’
পড়িতেছিল। তাহার ভবানন্দ জীবানন্দ ছোটখুড়ীমার আকস্মিক

শুভাগমনে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, তাহার হাতের কসরতটা তিনি দেখিতে পাইয়াছেন কি না এবং তাহাই ঠিক অবগত না হওয়া পর্যন্ত তাহার বুকের মধ্যে চিপচিপ করিতে লাগিল।

শৈলজা কানাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, ওরে ওই ‘বিস্তীর্ণ জলরাশি’ এতক্ষণ হচ্ছিল কি?

কানাই মুখ তুলিয়া দুর্ভিক্ষপৌড়িত-কঢ়ে চিঁচি করিয়া বলিল, আমি নয় মা, বিপিন আর পটল।

কারণ ইহারাই তাহার বাঁদিক ডানদিকের মকদ্দুম প্রধান শক্তি। সে অসঙ্গে এই দুটি নিরপরাধীকে বিমাতার হস্তে অর্পণ করিল।

শৈলজা বলিল, কাউকে ত দেখচি নে, এরা সব পালাল কোথা দিয়ে?

এবাবে কানাই বিপুল উৎসাহে দাঢ়াইয়া উঠিয়া হাত বাঢ়াইয়া বিছানা দেখাইয়া বলিল, কেউ পালায় নি মা, সব ঐ নেপের মধ্যে চুক্তে।

তাহার কথা ও মুখচোখের চেহারা দেখিয়া শৈলজা হাসিয়া উঠিল। দুর হইতে সে ইহার গলাটাই বেশী শুনিতে পাইয়াছিল। এবার বড়জাকে সম্মোধন করিয়া বলিল, দিদি, খেয়ে ফেললে যে তোমাকে! হাত তোমার না ওঠে, একবার ধমকাতেও কি পার না? ওরে, ওই সব ছেলেরা—বেরো—চল আমার সঙ্গে।

সিঙ্গেথরী কিছুক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন, এখন যুক্তকঢ়ে দীর্ঘ বিরক্তভাবে বলিলেন, ওরা নিজের মনে খেলা কচে, আমাকে বাধেয়ে ফেলবে কেন, আর তোর সঙ্গেই বা যাবে কেন? না না, আমার সামনে কাউকে তোর মারধর কতে হবে না! যা, তুই এখান থেকে—লেপের ভেতর ছেলেরা হাঁপিয়ে উঠচে।

শৈলজা একটুখানি হাসিয়া বলিল, আমি কি শুধুই মারধর করি দিদি?

বড় করিস শৈল। ছোট বোনের মত তিনি নাম ধরিয়া

তাবিতেন। বলিলেন, তোকে দেখলে ওদের মুখ যেন কালিবর্ণ হয়ে যায়—আজ্ঞা যা না বাপু তুই স্মৃথি থেকে—ওরা বেঙ্কু।

আমি ওদের নিয়ে যাব। অমন করে দিবারাত্রি জালাতন করলে তোমার অশুধি সারবে না। পটল সবচেয়ে শাস্তি, সে শুধু তার বড়মার কাছে শুভে পাবে, আর সবাইকে আজ থেকে আমার কাছে শুভে হবে, বলিয়া শৈলজা জজ সাহেবের মত রায় দিয়া। বড়জায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি এখন ওঠো—হৃথ ধাও—ইঁ রে হরি, সাড়ে-ছ'টার সময় তোর মাকে ওষুধ দিয়েছিলি ত?

প্রশ্ন শুনিয়া হরিচরণের মুখ পাখুর হইয়া গেল। সে সন্তানদিগের সঙ্গে এতক্ষণ বনেজঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, দেশ উকার করিতে-ছিল, তুচ্ছ ঔষধ-পথের কথা তাহার মনেও ছিল না। তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

বিস্ত সিদ্ধেশ্বরী কৃষ্ণের বলিয়া উঠিলেন, ওষুধ-টুষুধ আর আমি থেতে পারব না শৈল।

তোমাকে বলিনি মিদি, তুমি চুপ কর বলিয়া হরিচরণের বিছানার অত্যন্ত সম্মিকটে সরিয়া আসিয়া বলিল, তোকে জিজ্ঞেস কচি, ওষুধ দিয়েছিলি?

তিনি ঘরে চুকিবার পূর্বেই হরিচরণ জড়সড় হইয়া উঠিয়া বসিয়াছিল, ভীতকঠে বলিল, মা থেতে চান না যে!

শৈলজা ধমক দিয়া উঠিল, ফের কথা কাটে। তুই দিয়েছিলি কি না, তাই বল?

খুড়ীর কঠোর শাসন হইতে ছেলেকে উকার করিবার জন্য সিদ্ধেশ্বরী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, কেন তুই এত রাস্তিরে হাঙ্গামা করে এলি বল ত শৈল? ওরে ও হরিচরণ, দিয়ে থা না শিগগির কি ওষুধ-টুষুধ আমাকে দিবি!

হরিচরণ একটু সাহস পাইয়া ব্যস্তভাবে শব্দ্যার অপর প্রাণ্তে নামিয়া পড়িল এবং দেরাজের উপর হইতে একটা শিশি ও ছোট

গেলাস হাতে করিয়া জননীর কাছে আসিয়া দাঢ়াইল ! ছিপি
খুলিবার উত্তোগ করিতেই শৈলজা সেইখান হইতে বলিল, গেলাসে
শুধু চেলে দিলেই হলো, না রে হরি ? জল চাইনে, মুখে দেবার
কিছু চাইনে, না ? এ ব্যাগারঠ্যালা কাজ তোমাদের আমি বা'র
কচি !

ওষধের শিশিটা হাতে করিতে পাইয়া হরিচরণের হঠাতে ভরসা
হইয়াছিল, বোধ করি ফাঁড়াটা আজিকার যত কাটিয়া গেল। কিন্তু
এই ‘মুখে দিবার কিছু’র প্রশ্নে তাহা উবিয়া গেল। সে নিঙ্গপায়ের
যত এদিকে ওদিকে চাহিয়া করঞ্চ কঠে বলিল, কোথাও কিছু নেই
যে খুড়ীমা !

না আনলে কোথাও কিছু কি উড়ে আসবে রে ?

সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া বলিলেন, ও কোথায় কি পাবে যে দেবে ?
এসব কি পুরুষমাঝুয়ের কাজ ? শৈলর যত শাসন এই ছেলেদের
ওপরে। নৌলিকে বলে যেতে পারিস নি ? সে মুখপোড়া মেয়ে তুই
আসা পর্যন্ত এ ঘর একবার মাড়ায় না—একবার চেয়ে দেখে না; মা
মরচে কি বেঁচে আছে ।

সে কি ছিল দিদি, সে আমার সঙ্গে পটলডাঙ্গায় গিয়েছিল যে ।

কেন গেল ? কোন হিসেবে তুই তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলি ? দে,
হরিচরণ, তুই শুধু চেলে দে—আমি অমনি খাব, বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী
অমুপস্থিত কল্পার উপর সমস্ত দোষটা চাপাইয়া দিয়া ওষধের জন্য
হাত বাঢ়াইলেন ।

একটু ধাম হরি, আমি আনচি, বলিয়া শৈল ঘর হইতে বাহির
হইয়া গেল ।

তুই

হরিশের স্ত্রী নয়নতারা বিদেশে থাকিয়া বেশ একটু সাহেবিয়ানা

শিখিয়াছিল। ছেলেদের সে বিলাতী পোশাক ছাড়া বাহির হইতে দিত না। আজ সকালে সিদ্ধেখরী আহিকে বসিয়াছিলেন, কণ্ঠা নৌলান্ধৰী ঔষধের তোড়জোড় শুমুখে লইয়া বসিয়াছিল, এমন সময় নয়নতারা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, দিদি, দৱজি অতুলের কোট তৈরি করে এনেচে, কুড়িটা টাকা দিতে হবে যে।

সিদ্ধেখরী আহিক ভুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, জামার দাম কুড়ি টাকা!

নয়নতারা একটু হাসিয়া বলিল, এ আর বেশী কি দিদি? আমার অতুলের এক-একটি স্বৃট তৈরী করতে ষাট-সপ্তাহ টাকা লেগে গেছে।

‘স্বৃট’ কথাটা সিদ্ধেখরী বুঝিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। নয়নতারা বুঝাইয়া বলিল, কোট প্যাণ্ট, নেকটাই—এইসব আমরা স্বৃট বলি।

সিদ্ধেখরী ক্ষুক্রভাবে মেয়েকে বলিলেন, নৌলা, তোর খুড়ীমাকে ডেকে দে, টাকা বা’র করে দিয়ে যাক।

নয়নতারা বলিল, চাবিটা দাও না—আমিই বা’র করে নিছি।

নৌলা উঠিয়া দাঢ়াইয়াছিল—সেই বলিল, মা কোথা পাবেন, লোয়ার সিন্দুকের চাবি বরাবর খুড়ীমার কাছে থাকে, বলিয়া চলিয়া গেল।

কথা শুনিয়া নয়নতারার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কহিল, ছোট-বো এতদিন ছিল না, তাই বুঝি দিনকতক সিন্দুকের চাবি তোমার কাছে ছিল দিদি?

সিদ্ধেখরী আহিক করিতে শুরু করিয়াছিলেন, জবাব দিলেন না।

মিনিট-দশেক পরে টাকা বাহির করিয়া দিতে শৈলজা যখন ঘরে আসিয়া ঢুকিল, তখন অতুলের নৃতন কোট লইয়া রৌতিমত আলোচনা শুরু হইয়া গিয়াছে। অতুল কোটটা গায়ে দিয়া ইহার কাটাঁট প্রভৃতি বুঝাইয়া দিতেছে এবং তাহার মাও হরিচৰণ মুঞ্চক্ষে চাহিয়া ফ্যাশন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করিতেছে।

অতুল বলিল, ছোটখুড়ীমা, তুমি দেখ ত কেমন তৈরি করেচে।

শৈল সংক্ষেপে বেশ বলিয়া। সিন্দুর খুলিয়া কুড়িটা টাকা গুণিয়া
তাহার হাতে দিজ ।

নয়নতারা উপস্থিত সকলকে শুনাইয়া নিজের ছেলেকে উদ্দেশ
করিয়া বলিল, তোর তোরঙ্গভরা পোশাক, তবু তোর আর কিছুতেই
হয় না ।

ছেলে অধীরভাবে জবাব দিল, কতবার বলব মা তোমাকে ?
আজকালকার ফ্যাশন এইরকম। কাটাইট অস্ততঃ একটাও এক-
রকমের না থাকলে লোকে হাসবে যে ! বলিয়া টাকা লইয়া বাহিরে
যাইতেছিল, হঠাৎ ধামিয়া বলিল, আমাদের হরিদা যা গায়ে দিয়ে
বাইরে যায়, দেখে আমারই লজ্জা করে। এখানে ঝুলে আছে,
ওখানে কুঁচকে আছে—ছি ছি, কি বিশ্রাই দেখায়। তারপর হাসিয়া
হাত-পা নাড়িয়া বলিল, ঠিক যেন একটা পাশবালিশ হেঁটে যাচ্ছে ।

ছেলের ভঙ্গী দেখিয়া নয়নতারা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল ।

নৌলা মুখ ফিরাইয়া হাসি চাপিতে লাগিল। হরিচরণ করণচক্ষে
ছেটখুড়ীর মুখপানে চাহিয়া লজ্জায় মাথাটা হেঁট করিল ।

সিদ্ধেশ্বরী নামেমাত্র আক্ষিক করিতেছিলেন, ছেলের মুখ দেখিয়া
ব্যথা পাইলেন। রাগ করিয়া বলিলেন, সত্যিই ত ! শব্দের প্রাণে
কি সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই শৈল ? দে না, বাছাদের সব ছটো
জামাটামা তৈরী করিয়ে ।

অতুল মুকবিবর মত হাত নাড়িয়া বলিল, আমাকে টাকা দাও
জ্যাঠাইমা, আমার দরজিকে দিয়ে দস্তরমতো তৈরী করিয়ে দেব—
বাবা, আমাকে ফাঁকি দেবার জ্ঞা নেই ।

নয়নতারা পুত্রের হঁশিয়ারি সম্মক্ষে কি-একটা বলিতে চাহিল,
কিন্তু তাহার পূর্বেই শৈল গম্ভীর দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, তোমার
জ্যাঠামো করতে হবে না বাবা, তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গে ।
শব্দের জামা তৈরী করবার লোক আছে। বলিয়া আঁচলে বাঁধা
চাবির গোছা ঝনাঁ করিয়া পিঠে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল ।

নয়নতারা সংক্রান্তি বলিল, দিদি, ছোটবোর কথা শুনলে ?
কেন, কি অন্যায় কথাটা অতুল বলেচে শুনি ?

সিদ্ধেশ্বরী জবাব দিলেন না। বোধ করি, ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে-
ছিলেন, তাই শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু শৈল শুনিতে পাইল।
সে তু পা পিছাইয়া আসিয়া মেজভায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,
ছোটবোর কথা দিদি অনেক শুনেচে—তুমিই শোননি। অতুল
ছোটভাই হয়ে হরিকে যেমন করে ভ্যাঙালে, আর তুমি খিলখিল
করে হাসলে—ও আমার পেটের ছেলে হলে আজ ওকে আমি জ্যান্ত
পুঁতে ফেলতুম। বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

ঘরমুক্ত সবাই স্তুক্ত হইয়া রহিল। ধানিক পরে নয়নতারা একটা
নিখাস ফেলিয়া বড়জাকে সম্মোধন করিয়া বলিল, দিদি, আজ
আমার অতুলের জন্মবার, আর ছোটবোঁ যা মুখে এল তাই বলে
তাকে গাল দিয়ে গেল।

সিদ্ধেশ্বরী ছই জায়ের কলহের স্থচনায় নিঃশব্দে সভয়ে ইষ্টনাম
জপিতে লাগিলেন।

নয়নতারা জবাব না পাইয়া পুনরায় কহিল, তুমি নিজে কিছু না
করে দিলে আমাদেরই যা হোক একটা উপায় করে নিতে হবে।

তপাপি সিদ্ধেশ্বরী কথা কহিলেন না। তখন নয়নতারা ছেলেকে
লইয়া ধৌরে ধৌরে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু মিনিট-দশেক পরে
সিদ্ধেশ্বরী আঙ্গিক সারিয়া গাত্রোথান করিতেই মেজবোঁ ফিরিয়া
আসিয়া দাঢ়াইল, কবাটের আড়ালে অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র।

সিদ্ধেশ্বরী সভয়ে শুক্ষমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি মেজবোঁ ?

নয়নতারা কহিল, সেই কথাই জানতে এসেছি। আমি কাক্ষৰ
খাইনে পরিনে দিদি যে, দাড়িয়ে মুখ বুজে ঝাঁটা খাবো।

সিদ্ধেশ্বরী তাহাকে শাস্তি করিবার অভিপ্রায়ে বিনীতভাবে
বলিলেন, ঝাঁটা মারবে কেন মেজবোঁ, ওর ঐরকম কথা। তা ছাড়।
তোমাকে ত বলেনি, শুধু—

শুধু অতুলকে জ্যান্ত পুঁততে চেয়েছিল। আর আমি খিলখিল
করে হাসি। শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না দিদি—আবার ঝাটা লোকে
কি করে মারে? ধরে মারেনি বলে তোমার মন ওঠেনি?

সিঙ্কেশ্বরী অবাক হইয়া গেলেন। আন্তে আন্তে বলিলেন ওকি
কথা মেজবো? আমি কি তাকে শিখিয়ে দিয়েচি?

মেজবো চাবির ব্যাপার হইতেই অন্তরে জলিয়া মরিতেছিল, উদ্ভত
ভাবে জবাব দিল, সে তুমই জানো। কেউ কারো মন জানতে যায়
না দিদি, চোখে দেখে, কানে শুনেই বলতে হয়। আমরা নৃতন লোক,
তোমার সংসারে এসে পড়ে যদি আপন-বালাই হয়ে থাকি, বেশ ততুমি
নিজে বললেই ত ভাল হয়, আর একজনকে লেলিয়ে দেওয়া কেন?

এ অভিযোগের উত্তর সিঙ্কেশ্বরীর মুখে ঘোগাইল না, তিনি
বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিলেন।

মেজবো অধিকতর কঠোরস্বরে কহিল, আমরাও ঘাস খাইনে দিদি,
সব বুঝি। কিন্তু এমন করে না তাড়িয়ে ছুটো মিষ্টি কথায় বিদেয়
করলেই ত দেখতে শুনতে ভাল হয়, আমরাও স-মানে চলে যাই।
উঃ—উনি শুনলে একেবারে আকাশ থেকে পড়বেন। যাকে তাকে
বলেবেড়ান, আমাদের বৈঠাকুরুন মাহুষ নয়—সাক্ষাৎ ঠাকুরদেবতা।

সিঙ্কেশ্বরী কাঁদিয়া ফেলিলেন। ক্রন্তস্বরে বলিলেন, এমন অপবাদ
আমার শক্তুরেও দিতে পারে না মেজবো। এ-সব কথা ঠাকুরপোকে
শোনানোর চেয়ে আমার মরণ ভাল। তোমরা এসেচ বলে আমার
কত অঙ্গাদ—আমার কানাই পটলকে আনো, আমি তাদের মাথায়
হাত দিয়ে—

কথাটা শেষ হইল না। শৈল একবাটি দুধ লইয়া ঘরে চুকিয়া
বলিল, আক্ষিক হয়েচে? একটু দুধ খাও দিদি।

সিঙ্কেশ্বরী কাঁচা ভুলিয়া টেঁচাইয়া উঠিলেন, বেরো আমার স্মৃতি
থেকে দূর হয়ে যা।

হঠাত শৈল থতমত খাইয়া চাহিয়া রহিল।

সিঙ্কেশ্বরী কাদিতে কাদিতে বলিলেন, তোর যা মুখে আসবে
তাই লোককে বলবি কেন ?

কাকে কি বলেচি ?

সিঙ্কেশ্বরী এ প্রশ্ন কানেও তুলিলেন না, তেমনি চেচাটো বলিতে
লাগিলেন, আমাকে বলে বলে তোর মুখ বেড়ে গেছে—কে তোর
কথার ধার ধারে লা ? সবাইকে তুই দিদি পেয়েচিস ? দূর হ
আমার স্মৃতি থেকে ।

শৈল সহজভাবে বলিল, আচ্ছা আচ্ছা, তুধ, খেয়ে নাও, আমি
বাচ্ছি । এ বাটটোয় আমার দরকার ।

তাহার নিরুদ্ধিগ্র কথা শুনিয়া সিঙ্কেশ্বরীঅগ্নি মূর্তি হইয়া উঠিলেন,
খাবো না, কিছু খাবো না, তুই যা । হয় তুই বাড়ি থেকে বেরো, না
হয় আমি বেরোই—তুটোর একটা না করে আমি জলস্পর্শ করব না ।

শৈল তেমনি সহজ গলায় বলিল, আমি এই সেদিন এসেচি দিদি
এখন যেতে পারব না তার চেয়ে বরং তুমিই গিয়ে আর দিনকতক
কাটোয়ায় ধাকগে কাছেই গঙ্গা—অমনি বাঁ'র করে নিয়ে গেলেই হবে ।
আচ্ছা মেজদি, কি তুচ্ছ কথা নিয়ে সকালবেলা তোলপাড় ক'চ বল ত ?

অরে অরে দিদি আধমরা হয়ে রয়েছে, ওঁকে কেন বিঁ'চ ? আমি
যদি দোষ করে ধাকি, আমাকে বললেই ত হয়—কি হয়েচে বল ?

সিঙ্কেশ্বরী চোখ মুছিয়া হাসিয়া বলিলেন, আজ অতুলের
জন্মদিন, কেন তুই বাচ্ছাকে অমন কথা বললি ?

শৈল হাসিয়া উঠিল, ওঁ এই ! কিছু ভয় করো না মেজদি—
তোমার মত আমিও ত মা । আমার হরিহরণ, কাঞ্জ, পটল যেমন,
অতুলও তেমনি । মায়ের কথায় গাল লাগে না মেজদি ; আচ্ছা,
আমি তাকে ডেকে আশীর্বাদ করছি—নাও দিদি, তুমি খেয়ে নাও,
আমি কড়া চড়িয়ে এসেচি ।

সিঙ্কেশ্বরীর মুখে কাঞ্জার সঙ্গে হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন,
আচ্ছা, তোর মেজদির কাছেও ঘাট মান, তুই তাকেও মন্দ বলেচিস ।

ଆଛା ମାନଚି, ବଲିଯା ଶୈଳ ତଙ୍କଣାଂ ହେଟ ହଇଯା ହାତ ଦିଲା
ନୟନ-ତାରାର ପା ଛୁଟିଯା କହିଲ, ସଦି ଅସ୍ଥାୟ କରେ ଥାକି ମେଜଦି, ମାପ
କର—ଆମି ଘାଟ ମାନଚି ।

ନୟନତାରା ହାତ ବାଡ଼ାଇଯା ତାହାର ଚିବୁକ ସ୍ପର୍ଶ କରିଯା ଚୁଷନ କରିଯା
ମୁଖଥାନା ହାତିର ମତ କରିଯା ଚୁପ କରିଯା ରହିଲ ।

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀର ବୁକେର ଭାରୀ ବୋକା ନାମିଯା ଗେଲ । ତିନି ସ୍ନେହେ
ଆମନ୍ଦେ ଗଲିଯା ଗିଯା ନୟନତାରାର ମତ ଛୋଟଜାଯେର ଚିବୁକ ସ୍ପର୍ଶ କରିଯା
ମେଜଜାକେ ସମ୍ବେଧନ କରିଯା ବଲିଲେନ, ଏ ପାଗଲୀର କଥାୟ କୋନଦିନ
ରାଗ କରୋନା ମେଜବୋ । ଏହି ଆମାକେଇ ଦେଖ ନା—ଓକେ ବକା-ଥାକି କତ
ଗାଲମନ୍ଦ କରି; କିନ୍ତୁ ଏକଦଣ ଦେଖତେ ନା ପେଲେ ବୁକେର ଭେତରେ କି ସେଣ
ଆଚଢାତେ ଥାକେ—ଏତ ଦୁଃ ତ ଖେତେ ପାରବ ନା ଦିଦି ।

ପାରବେ, ଥାଓ ।

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ଆର ତର୍କ ନା କରିଯା ଜୋର କରିଯା ସମଞ୍ଜଟା ଥାଇଯା
ଫେଲିଯା ବଲିଲେନ, ଏକ୍ଷୁଣି ବାହାକେ ଡେକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଲ ଶୈଳ ।

ଏକ୍ଷୁଣି କରଚି, ବଲିଯା ଶୈଳ ହାସିଯା ଥାଲି ବାଟିଟା ହାତେ କରିଯା
ବାହିର ହଇଯା ଗେଲ ।

ତିନ

ଅତୁଳ ଏମନ ଅପ୍ରକୃତ ଜୀବନେ ହୟ ନାହିଁ । ଶୈଶବ ହିତେ ଆଦରସରେ
ଲାଲିତ ପାଲିତ; ବାପ-ମାକୋନଦିନତାହାର ଇଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦର ବିନନ୍ଦେ
କଥା କହିଲେନ ନା । ଆଜ ସକଳେର ସମ୍ମୁଖେ ଏତବ୍ଦ ଅପମାନ ତାହାର
ସର୍ବାଙ୍ଗ ବେଡ଼ିଯା ଆଶ୍ରମ ଜ୍ଞାଲାଇଯା ଦିଲ । ସେ ବାହିରେ ଆସିଯା ନୃତ୍ୟ
କୋଟଟା ମାଟିତେ ଛୁଟିଯା ଫେଲିଯା ଦିଯା ପ୍ରାଚାର ମତ ମୁଖ କରିଯା ବସିଲା ।

ଆଜ ହରିଚରଣେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାନୁଭୂତି ଛିଲ ଅତୁଲେର ଉପର । କାରଣ,
ତାହାରଇ ଓକାଳତି କରିଲେ ଗିଯା ସେ ଲାଖିତ ହଇଯାଛେ—ତାଇ ସେଇ
ତାହାର ପାଶେ ଆସିଯା ମୁଖ ଭାରୀ କରିଯା ବସିଲା । ଇଚ୍ଛାଟା—ତାହାକେ
ସାମ୍ବନ୍ଧନା ଦେଇ; କିନ୍ତୁ ସମୟେବପରେ ଏକଟା କଥା ଓ ଖୁଜିଯା ନା ପାଇଯା

মৌন হইয়া রহিল ।

কিন্তু প্রতুলের আর ত চূপ করিয়া ধাকা চলে না । কারণ, অপমানটাই এ ক্ষেত্রে তাহার একমাত্র ক্ষোভের বস্তু নয়, সে বিদেশ হইতে অনেক ফ্যাশন, অনেক কোট-প্যান্ট নেকটাই লইয়া ঘরে ফিরিয়াছে নানা রকমে অনেক উচুতে তৃলিয়া নিজের আসন বাঁধিয়াছে, আজ ছোটখুড়ীমার একটা তিরঙ্গারের ধাকায় অক্ষয় সমস্ত ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া একাকার হইয়া যায়দেখিয়া সে উৎকর্ণ্য চঞ্চল হইয়া উঠিল । হরিদাকে উদ্দেশ করিয়া সরোবে বলিল, আমি কারো কথার ধার ধারিবে বাবা ! এ শর্মা অতুলচন্দ্র—রেগে গেলে ও-সব ছোটখুড়ী-টুড়ী কাউকে কেয়ার করে না ।

হরিচরণ এদিকে ওদিকে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে প্রত্যন্তর করিল, আমিও করিনে—চূপ, কানাই আসছে । পাছে নির্বোধ অতুল উহারই সম্মুখে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বসে এই ভয়ে সে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঢ়াইল ।

কানাই দ্বারের বাহিরে দাঢ়াইয়া মোঘল-বাদশার নকিবের মত উচ্চকর্ণে হাঁকিয়া কহিল, মেজদা, সেজদা, মা ডাকচেন—শিগগির ।

হরিচরণ পাংশুমুখে কহিল, আমাকে ? আমি কি করেচি ! আমাকে কথ-খন নয়—যাও অতুল, ছোটখুড়ীমা ডাকচেন তোমাকে ।

কানাই প্রতুলের স্বরে কহিল, ছ'জনকেই—ছ'জনকেই—এক্ষুণি—অঁয়া, সেজদা তোমার নতুন কোট মাটিতে ফেলে দিলে কে ?

প্রত্যন্তরে সেজদা শুধু মেজদার মুখের পানে চাহিল, এবং মেজদা সেজদার মুখের পানে চাহিল, কেহই সাড়া দিল না । কানাই ভুলুষ্টিত কোটটা চেয়ারের হাতলে তৃলিয়া, দিয়া চলিয়া গেল ।

হরিচরণ শুক্রকর্ণে কহিল, আমার আর ভয় কি, আমি ত কিছু বলিনি—তুমি বলেচ ছোটখুড়ীমাকে কেয়ার কর না—

আমি একা বলিনি, তুমি বলেচ, বলিয়া অতুল সগর্বে বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল । ভাবটা এই যে, আবশ্যক হইলে সে সত্য কথা প্রকাশ করিয়া দিবে ।

হরিচরণের চেহারা আরও ধারাপ হইয়া গেল। একে ত ছোট-খুড়ীমা যে কেন ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা জানা নাই, তাহাতে কাণ্ডজ্ঞানহীন অতুল কি যে বলিয়া ফেলিবে তাহাও আল্মাজ করা শক্ত। একবার ভাবিল, সেও পিছনে গিয়া উপস্থিত হয় এবং সর্বপ্রকার নালিশের রৌতিমত প্রতিবাদ করে। কিন্তু, কিছুই তাহার সাধ্যায়ত্ব বলিয়া ভৱসা হইল না। এদিকে হাজিরির সময় নিকটতর হইয়া আসিতেছে—কানাই শমন ধরাইয়া গিয়াছে, এবার নিশ্চয় ওয়ারেন্ট লইয়া আসিবে। হরিচরণ আস্তরক্ষার উপস্থিত আর কোন সচপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, সহসা গাড়ুটা হাতে তুলিয়া লইয়া বিশেষ একটা স্থানের উদ্দেশে সবেগে প্রস্থান করিল। ছোট খুড়ীমাকে বাড়িস্বন্দ লোক বাঘের মত ভয় করিত।

অতুলভিতরে রেচুকিয়া সংবাদ জানিল, ছোটখুড়ীমা নিরামিষ-রাম্বাৰে আছেন। সে বুক ফুলাইয়া দোরগোড়ায় আসিয়া দাঢ়াইল। কারণ, এ বাটীৰ অস্থায় ছেলেদেৱ মত সে এই ছোটখুড়ীমাটিকে চিনিবাৰ অবকাশ পায় নাই। স্ত্ৰীলোকেও যে ইস্পাতেৱ মত শক্ত হইতে পারে ইহা সে জানিতই না। অথচ, সাধাৰণ দৰ্বলচিত্ত ও মৃত্যু আঘৰীয়-আঘৰীয়তাৰ কাছে জ্ঞাবধি প্ৰশ্ৰয় পাইয়া তাহাৰ মা, খুড়ী, জ্যাঠাই প্ৰভৃতি গুৰুজন সমৰ্কে একটা অস্তুদ ধাৰণা জন্মিয়াছিল, ইহাদিগেৱ মুখেৱ উপৰ শুধু কড়া জৰাব দিতে পাৱিলেই কাজ পাওয়া যায়। অৰ্থাৎ নিজেৰ ইচ্ছাটা খুব জোৱে প্ৰকাশ কৰিতে পাৱাচাই। তাহা হইলেই ইহাৰা সাময় দেন, অঞ্চলা দেন না। যে ছেলে ইহা না পারে তাহাকে চিৰকাল টেকিয়া মৰিতেই হয়। এখানে আসিয়া অবধি সেহৰিচৰণেৱ বেশভূষাৰ অভাৱ লক্ষ্য কৰিয়া এই ফন্দিটাগোপনেতাহাকে শিখাইয়াও দিয়াছিল। অথচ, এইমাত্ৰ নিজেৰ বেলায় কোন ফন্দি ধাটে নাই, ছোটখুড়ীমাৰ তাড়া ধাইয়া কড়া জৰাৰ তটেৱ দূৰেৱ কথা—কোনপ্রকাৰ জৰাৰই মুখে ঘোগায় নাই—হত্যুক্তিৰ মত নিঃশব্দে বাহিৱে চলিয়া আসিয়াছিল। তাই এখন ফিৰিয়া গিয়া সমস্ত অপমান কড়ায়-গণ্ডায়

শোধ দিবার অভিপ্রায়েসে অমনমরিয়ার মত রান্নাঘরের দ্বারের কাছে
গিয়া দাঢ়াইয়াছিল। এই স্থানটা হইতে শৈলজার মুখের কিয়দংশ
স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, এমনকি মুখতুলিলেইতিনি অতুলকে দেখিতে
পাইতেন; কিন্তু রান্নায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় অতুলের পায়ের শব্দ
শুনিতে পাইলেন না, মুখ তুলিয়াও চাহিলেন না। কিন্তু অতুল
খুড়ীমাকে আজ ভাল করিয়া দেখিল নিমিষমাত্র, তথাপি সে অনুভব
করিল এ মুখ তাহার মাঝের নয়, জ্যাঠাইয়ার নয়—এ মুখের স্মৃতি
দাঢ়াইয়া নিজের অভিপ্রায় জোর করিয়া ব্যক্ত করিবার মতজোরআর
যাহারই থাক, অন্ততঃ তাহার গলায় নাই। তাহার বিশ্বারিত বক্ষ
আপনি কুঞ্চিত হইয়া গেল এবং সে চুপ করিয়া দাঢ়াইয়া রহিল।
তাহার এটুকু পর্যন্ত সাহস হইল না—কোনরকম সাড়া দিয়াও ছোট
খুড়ীমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নৌলা কি কাজে এই দিকে আসিতেছিল। হঠাৎসেজদার পায়ের
দিকে চাহিয়া সে ধমকিয়া জিভ কাটিয়া দাঢ়াইল, এবং অলক্ষ্যে থাকিয়া
ভীত ব্যাকুল ইঙ্গিতে পুনঃ পুনঃ তাহাকে জানাইলাগিল, জুতা পায়
দিয়া দাঢ়াইবার স্থান ওটা নয়।

ছোটখুড়ীমার আনত-মুখের প্রতি কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া অতুল
অন্তরে কষ্টকিত হইয়া উঠিল। একবার মনে করিল নিঃশব্দে সরিয়া
যায়, একবার ভাবিল, জুতা-জোড়াটা হাতে তুলিয়া উঠানে ছুঁড়য়া
ফেলিয়া দেয়। কিন্তু ছোটবোনের স্মৃতি ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ করিতে
তাহার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল। এই নিষেধটা সে যথার্থই জানিত
না এবং স্পর্ধাপূর্বক তাহার অমাণ্ডও করেনাই। কিন্তু পিতামাতার কাছে
নিরস্তর অবারিত ও অসন্তু প্রশ্নে তাহার অভিমান এতই সূক্ষ্ম ও
তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে একটা কাজ করিয়া ফেলিয়া শেষে ভয়ে
পিছাইয়া দাঢ়াইতে তাহার মাথা কাটা যাইত। ভীত-বিবর্ণমূখ্যে
সেইখানে দাঢ়াইয়া নিজের সর্বনাশ উপলব্ধি করিয়াও সে অভিমানী
দুর্বোধনের মত সূচ্যাগ্র ভূমিও পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

শৈলজা মুখ তুলিল। সন্নেহে যুদ্ধহাসিয়াবলিল, অতুল এসেচিস? দাঢ়া বাবা-ও কি বে! জুতো পায়ে? নীচে যা—নীচে যা—

বাড়ির আর কোন ছেলে অমুক্রপ অবস্থায় শৈলজার হাতে এত সহজে নিষ্কৃতি পাইলে ছুটিয়া পলাইয়া বাঁচিত, কিন্তু অতুল ঘাড় গঁজিয়া দাঢ়াইয়া রহিল।

শৈলজা উঠিয়া দাঢ়াইয়া বলিল, জুতো পায়ে দিয়ে এখানে আসতে নেই অতুল, নীচে যা-ও।

অতুল শুকমুখে ক্ষীণস্বরে কহিল, আমি ত চৌকাঠের বাইরে দাঢ়িয়ে আছি—এখানে দোষ কি?

শৈলজা ধমকাইয়া উঠিল, দোষ আছে—যা-ও।

অতুল তথাপি নড়িলনা; সে মানসচক্ষে দেখিতেলাগিল, হরিচরণ কানাই, বিপিন প্রভৃতি আড়াল হইতে তাহার সাঙ্গনা উপভোগ করিতেছে। তাই বজ্জাত ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, আমরা চুঁচড়ার বাড়িতে ত জুতো পায়ে দিয়েই রাম্ভাঘরে যেতুম—এখানে চৌকাঠের বাইরে দাঢ়ালে কিছু দোষ নেই।

ইহার স্পর্ধা দেখিয়া শৈলজা ছঃসহ বিশ্বায়ে শুক হইয়া দাঢ়াইয়া রহিল। শুধু তাহার ছই চোখ দিয়া যেন আগুন ফুটিয়া বাহির হইতে নাগিল।

ঠিক এই সময়ে হরিচরণের বড়ভাই মণীন্দ্র ডাম্বেল ও মুগ্রে ভঁজিয়া ঘরান্তকলেবরে বাইরে যাইতেছিল। শৈলজার চোখের দিকে গাহিয়া সবিশ্বায়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে খুড়ীমা?

ক্রোধে শৈলজা মুখ দিয়া স্পষ্ট কথা বাহির হইল না। নীলা দাঢ়াইয়াছিল, অতুলের পায়ের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া লিল, সেজন্ম জুতো পায়ে দিয়ে দাঢ়িয়ে আছে—কিছুতে নাবছে না।

মণীন্দ্র হাকিয়া কহিল, এই—নেবে আয়!

অতুল গো-ভরে বলিল, এখানে দাঢ়াতে দোষ কি? ছোটখূড়ী রামাকে দেখতে পাবে না বলে শুধু যা কচে।

ମଣିଲ୍ଲ ଡାକ କରିଯା ରକେର ଉପର ଲାଫାଇସା ଉଠିଯା ଅତୁଳେଙ୍କ
'ଗଣେ ଏକଟା ଅଚଣ୍ଗ ଚପେଟାବାତ କରିଯା କହିଲ, 'ଛୋଟଖୁଡ଼ି' ନୟ—
'ଛୋଟଖୁଡ଼ିମା'; 'ବଚେ' ନୟ—'ବଚେନ'—ବଲାତେ ହୟ—ଇତରକୋଥାକାର ।

ଏକେ ମଣିଲ୍ଲ ପାଲୋଯାନ ଲୋକ, ଚଢ଼େର ଓଜନଟାଙ୍ଗଠିକ ବାଧିତେ ପାରେ
ନାହି, ଅତୁଳ ଚୋଖେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖିଯା ବନ୍ଦିଯା ପଡ଼ିଲ ।

ମଣିଲ୍ଲ ଭାବୀ ଅପ୍ରତିଭହିଇସା ଗେଲ । ଏକଟାଆଘାତ କରା ସେ ଇଚ୍ଛାଭ
କରେ ନାହି, ଅବଶ୍ୟକ ମନେ କରେ ନାହି । ବ୍ୟକ୍ଷତାବେ ଝୁଁକିଯା ପଡ଼ିଯା
ତାହାର ହାତଛଟା ଧରିଯା ଦାଢ଼ କରାଇସା ଦିବାମାତରି ଅତୁଳ କ୍ରୋଧୋମୃତ-
ଚିତ୍ତାବାସେର ମତ ମଣିଲ୍ଲେର ଗାଯେର ଉପର ଲାଫାଇସା ପଡ଼ିଯା, ଅଂଚଢ଼ାଇସା
କାମଢ଼ାଇସା ଏମନ ସକଳ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ପର୍କ ଧରିଯା ଡାକିତେ ଲାଗିଲ, ସାହା
ହିନ୍ଦୁସମାଜେ ଥାକିଯା, ଜ୍ୟାଠତୁତ-ଖୁଡ଼ତୁତ ଭାବେର ମଧ୍ୟେ ହଣ୍ଡୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଅନୁଷ୍ଠବ । ମଣି ଅର୍ଥମଟା ବିଶ୍ୱାସେ ଏକେବାରେ ହତ୍ୟାକୁ ହଇସା ଗେଲ । ସେ
ମେଡିକ୍ୟାଲ କଲେଜେର ଟୁଚୁ କ୍ଲାସେ ପଡ଼େ ଏବଂ ବୟସେ ଛୋଟ ଭାଇଦେର ଚୟେ
ଅନେକଟାଇ ବଡ଼ । ତାହାରା ବଡ଼ଭାଇୟେର ଶ୍ଵମୁଖେ ଦ୍ଵାଢ଼ାଇସା ଚୋଥ ଭୁଲିଯା
କଥା କହିତେ ପାରେ ନା । ଏ ବାଢ଼ିତେ ଇହାଇ ସେ ଚିରକାଳ ଦେଖିଯା
ଆସିଯାଛେ । କେହୁଁ ଏହି-ସମକ୍ଷ ଅକଥ୍ୟ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଗାଲିଗାଲାଜ ଉଚ୍ଚାରଣ
କରିତେ ପାରେ ଇହା ତାହାର କଲ୍ପନାର ଅଗୋଚର । ଆର ତାହାର ହିତାହିତ
ଜ୍ଞାନ ରହିଲ ନା—ଅତୁଳେର ଘାଡ଼ ଧରିଯା ସଜୋରେ ତାହାକେ ସାମେର ଉପର
ନିକ୍ଷେପ କରିଯା, ଲାଧି ମାରିଯା ମାରିଯା ଠେଲିଯା ଉପର ହିତେ ପ୍ରାତିଶେର
ଉପର ଫେଲିଯା ଦିଲ । କାନାଇ, ବିପିନ, ପଟଳ ପ୍ରଭୃତି ଛୋଟ ଛୋଟ
ଛେଲେମେଯେବା ରୈ ରୈ ଚୀକାର କରିଯା ଉଠିଲ । ମଣିଲ୍ଲେର ମା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ
ଆହିକ ଫେଲିଯା ଛୁଟିଯା ଆସିଲେନ, ମେଜବଧୁ ନିର୍ଜନ ଘରେ ବନ୍ଦିଯା ଗୋଟା—
ହଇ ସନ୍ଦେଶ ଗାଲେ ଦିଯାଜଳଥାଇବାର ଉତ୍ତୋଗ କରିତେଛିଲେନ—ଗୋଲମାଳ
ଶୁନିଯାବାହିରେ ଆସିଯା ଏକେବାରେ ନୌଲବର୍ଷ ହଇସାଗେଲେନ । ମୁଖେର ସନ୍ଦେଶ
ଫେଲିଯା ଦିଯା, ମଡ଼ାକାନ୍ତା ଭୁଲିଯା ଝାପାଇସା ଆସିଯା ଛେଲେର ଉପର ଉପ୍ରକୃତ
ହଇସା ପଡ଼ିଲେନ । ସମନ୍ତଟା ମିଲିଯା ଏମନି ଏକଟା ଗଣ୍ଗଗୋଲ ଉଠିଲ ସେ,
ବାହିର ହିତେ କର୍ତ୍ତାର କାଜକର୍ମ ଫେଲିଯା ଛୁଟିଯା ଆସିଯା ଉପର୍ଦ୍ଵିତୀ

হইলেন ।

৪৬জ্ঞা রাজ্যাদ্বর হইতে মুখ বাড়াইয়া মলিল, মণি, তৃষ্ণ বাইরে
বা । বসিয়া পুনরাবৃ নিজের কাছে ঘন দিস । মণি নিঃশব্দে চপিয়া
গেল । তাহার পিতা মেজবৌমার উদ্ধান ভঙ্গী দেখিয়া লজ্জা পাইয়া
শ্রেষ্ঠান করিলেন ।

এই মহামাঝী ব্যাপার কতকটা শান্ত হইয়া গেলে, হরিশ
হেলেকে প্রশ্ন করিলেন ।

অতুল কাঁদিতে কাঁদিতে ছোটখূঢ়ীর প্রতিসমস্ত দোষারোপ করিয়া
কহিল, ও বড়দাকে মারতে শিখিয়ে দিলে—ইত্যাদি ইত্যাদি ।

হরিশ চোৎকার করিয়া বসিলেন, ছোটবৌমা, মণিকে ষে তুমি খুন
করতে শিখিয়ে দিলে, কেন শুনি ?

নৌলা রাজ্যাদ্বরের ভিতর হইতে ছোটখূঢ়ীর হইয়া জ্বাব দিল,
সেজবা কথা শোনেন নি, আর বড়দাকে গালাগালি দিয়েচেন, তাই ।

নয়নতাঙ্গা হেলের তরফ হইতে বনিল, তবে আমিও বজি ছোটবৌ
—তোমার হস্তমে ওকে মেরে ফেসছিল বসেই প্রাণের দায়ে ও গাল
দিয়েচে, নইলে গাল দেবার হেলে ত আমার অতুল নয় ।

নয়ই ত । বলিয়া সায় দিয়া হরিশ আরও কুক্ষস্বরে জানিতে
চাহিলেন—তোর ছোটখূঢ়ীকে জিজ্ঞাসা কর নৌলা, উনি কে ষে
অতুলকে মারতে হস্ত দেন ? কথা যখন ও না শুনছিল, তখন কেন
আমাদের কাছে নালিশ না করাইল ? আমরা উপস্থিত থাকতে উনি
শাসন করতে গেলেন কেন ?

নৌলা এই তিনটি প্রশ্নের একটাৰও উত্তর দিল না ।

সিদ্ধেশ্বরী এতক্ষণ বারান্দার একধারে অবসম্ভৱে মত চূপ করিয়া
বসিয়াছিলেন । তাহার পৌড়িত দেহে এই উদ্দেশ্ননা অত্যবিক হইয়া
পরিয়াছিস । একে ত, এসংসারের তিনিহেলেপুনে মানুষ করা ছাড়া
মহজে কোন বিষয়েই কথা কহিতে চাহিলেন না, কারণ তাহার মনে
মনে বিশ্বাস ছিল, ভগ্যান এ বাটীৰ সম্বন্ধে সুবিচার কৰেন নাই ।

ତୋହାକେ ବଡ଼ବଧୁ ଏବଂ ଗୃହିଣୀ କରିଯାଓ ଉପଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଦେନ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଶୈଳକେ ସକଳେର ଛୋଟ ଏବଂ ଛୋଟବୌ କରିଯାଓ ରାଶିଅମାଗ ବୁଦ୍ଧି ଦିଯାଛେନ । ହିସାବ କରିତେ, ଚିଠିପତ୍ର ଲିଖିତେ, କଥାବାର୍ତ୍ତ କହିତେ, ରୋଗେ ଶୋକେ ଚାରିଦିକେ ନଜର ରାଖିତେ, ସକଳକେ ଶାସନ କରିତେ, ବାଧିତେ-ବାଡ଼ିତେ, ସାଜାଇତେ-ଗୁଛାଇତେ ଇହାର ଜୁଡ଼ି ନାହିଁ । ତିନି ଆୟହି ବଲିଦେନ, {ଶୈଳ ଆମାର ପୁରୁଷମାତ୍ର ହଇଲେ ଏତଦିନେ ଜଜ ହଇତ । ସେଇ ଶୈଳକେ ସଥନ ମେଜକର୍ତ୍ତା କଟ୍ଟିବା କରିତେ ଲାଗିଲେନ, ତଥନ ହଠାତ୍ ବୋଧ କରି, ଭଗବାନ ତୋହାର ମଧ୍ୟେ ଗୃହିଣୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୁଦ୍ଧି ଗୁଜିଯା ଦିଯା ଗେଲେନ ।

ସିଦ୍ଧେଖରୀ ଏକଟ୍ଟ କ୍ଳଙ୍କସ୍ତରେ ବଲିଯା ଫେଲିଲେନ, ବେଶତମେଜଠାକୁରପୋ, ତାଇ ସଦି ହୟ, ତବେ ତୁମିହି ବା ଆମାଦେର କାହେନାଲିଶନା କରେ ନିଜେ ଶାସନ କରଛେ କେନ ? ମା ବେଁଚେ, ଆମି ବେଁଚେ—ବି-ବୌକେ ଶାସନ କରନ୍ତେ ହୟ ଆମରା କରବ ! ତୁମି ପୁରୁଷମାତ୍ର, ଭାଙ୍ଗର—ଓ କି କଥା—ବାଇରେ ଯାଓ । ଲୋକେ ଶୁନଲେ ବଲବେ କି !

ହରିଶ ଲଜ୍ଜା ପାଇୟା ବଲିଲେନ, ତୁମି ସବଦିକେ ଦୃଷ୍ଟି ରାଖିଲେଭାବନାକି ବୌଠାବକରନ । ତା ହଲେ କି ଏକଜନ ଆର ଏକଜନକେ ବାଡ଼ିର ମଧ୍ୟେ ହତ୍ୟା କରେ ଫେଲତେ ପାରେ ? ବଲିଯା ବାଇରେ ସାଇବାର ଉପକ୍ରମ କରିତେଇ ତୋହାର ଶ୍ରୀ ବାଧା ଦିଯା ବଲିଲେନ, ବେଶ ତ, ଦୀଦିଯେ ଦେଖଇ ନା, ଉନି ବି-ବୌକେ କେମନ ଶାସନ କରେନ ।

ହରିଶ ମେ କଥାର ଆର ଜବାବ ନା ଦିଯା ବାହିରେ ଚଲିଯା ଗେଲେନ ।

ଚାର

ଦିନ-ପୌତ୍ରକ ପରେ ସକାଳ ହଇତେଇ ମେଜଗିଲୀଦେଇଜିନିସପତ୍ର ବୀଧା-ହୀନା ହଇତେଛିଲ । ସିଦ୍ଧେଖରୀ ତୋହା ଶକ୍ତ୍ୟ କରିଯା ଦାରେର ସାହିରେ ଆସିଯା ଦୀଡାଇଲେନ । ମିନିଟ୍-ବାନେକ ନିଃଶ୍ଵେ ଚାହିୟା ଧାକିମ୍ବା କହିଲେନ, ଆଜ ୧-ସବ କି ହଜେ ମେଜବୌ ॥

ନୟନତାରା ଉଦ୍‌ବସଭାବେ ଜ୍ଵାବ ଦିଲେ, ଦେଖିତେଇ ତ ପାଚ ।

ତା ତ ପାଚ । କୋଥାଯ ଯାଓଯା ହବେ ?

ନୟନତାରା ତେମନିଭାବେ କହିଲ, ଯେଥାନେ ହୋକ ।

ତୁ, କୋଥାଯ ଶୁଣି ?

କି କରେ ଜାନବ ଦିଦି, କୋଥାଯ ? ଉନି ବାସା ଠିକ କରତେ ବେରିରେ-
ଛେନ ଫିରେ ନା ଏଲେ ତ ବଲତେ ପାରିନେ ।

ତୋମାର ଭାଙ୍ଗର ଶୁନେଚେନ ?

ତାକେ ଶୁନିଯେ କି ହବେ ? ସାର ଶୋନା ଦରକାର, ସେଇ ଛୋଟଗିନ୍ନୀ
ଶୁନେଚେନ, ଆଡ଼ାଲେ ଦ୍ଵାରିଯେ ଏକବାର ଦେଖେ ଗେଛେନ ।

ଏଟା ନୟନତାରାର ମିଛେ କଥା । ଶୈଳଜାର ଏହି ସକାଳ ବେଳାଟାଯ
ନିଶ୍ଚାସ ଫେଲିବାର ଅବକାଶ ଥାକେ ନା—ମେ କିଛୁଇ ଜାନିତ ନା ।

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କ୍ଷଣକାଳ ମୌନ ଥାକିଯା ବଲିଲେନ, ଦେଖ ମେଜବୌ, ଏହି
ଭାଙ୍ଗରେ ମାନ-ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତୋମରା ବୁଝଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ବାଇରେର ଲୋକକେ
ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେ ଶୁନତେ ପାବେ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେର ତପଶ୍ଚାର ଫଳେଇ
ଏମନ ଭାଙ୍ଗର ପାଓଯା ଯାଇ, ନଇଲେ ପାଓଯା ଯାଯ ନା ।

ନୟନତାରା ସହସାଉଦୀଶ୍ଵର ହଇଯାଉଟିଲ ; ବଲିଲ, ଆମରା ମେ କଥା କି
ଜାନିନେ ଦିଦି ? ହଜନେ ବିଦାରାତ୍ରି ବଲାବଲି କରି, ଶୁଦ୍ଧ ଭାଙ୍ଗର ନୟ,
ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଏମନ ବଡ଼ଜା ମେଲେ । ତୋମାର ବାଡ଼ିତେ ଆମରା ସରଦୋର
ଝାଟ ଦିଯେ ଚାକରଦେର ମତ ଥାକତେ ପାରି, କିନ୍ତୁ ଏଥାନେ ଆର ଏକଦଣ
ବାସ କରତେ ପାରବ ନା ।

ଆଜ ନୟନତାରାର କଠିନରେ ଏମନ ଏକଟୁ ଆନ୍ତରିକତାର ଆଭାସ
ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀର କାନେ ବାଜିଲ ଯେ, ତିନିଆଜ୍ର ହଇଯା ପଡ଼ିଲେନ । କହିଲେନ,
ଏ ଆମାର ବାଡ଼ି ତ ନୟ ମେଜବୌ, ବାଡ଼ି ତୋମାଦେଇ । କୋନମତେଇ
ତୋମାଦେର ଆମି ଆର କୋଥାଓ ଯେତେ ଦିତେ ପାରବ ନା ।

ନୟନତାରା ଘାଡ଼ ନାଡିଯା କରଣକଟେକହିଲ, ଯଦି କଥନଭଗବାନତେମନ
ଦିନ ଦେନ ଦିଦି, ତା ହଲେ ତୋମାର କାହେ ଏମେଇ ଆମରା ଥାକବ ; କିନ୍ତୁ,
ଏଥାନେ ଏକଟି ଦିନ ଆର ଥାକତେ ବଲୋ ନା ଦିଦି । ଆମାର ଅତୁଳ

হয়েচে সকলের চক্ষুসূল ; অহুমতি দাও, তাকে নিয়ে আমরা সরে
যাই ।

সিদ্ধেশ্বরী অত্যন্ত ক্ষুক হইয়া বলিলেন, সে কি কথা মেজবৈ ?
দৈবাং এফদিন একটাকাণ্ড হয়েগেছেবলে কি সেই কথা মনে রাখতে
আছে ? অতুল আমাদের ছেলে—

কথাটা শেষ হওয়া পর্যন্তও নয়নতারা ধৈর্য ধরিতে পারিল না ;
বলিয়া উঠিল—কোন কথা মনেরাখতেপারিনেবলে কত বকুনি থেঁয়ে
মরি দিদি । ঐ যখন হলো, তখনই হাউমাউ করে কেঁদেকেটে মরি,
কিন্তু একদণ্ড পরে আমি যে গঙ্গাজল সেই গঙ্গাজল—একটি কথাও
আমার স্মরণ থাকে না । আমি ত সমস্তই ভুলেই গিয়েছিলুম ; কিন্তু
রাগ করতে পাবে না দিদি—তুমি যতই বল, আমাদেরছোটবো সহজ
মেঁয়ে নয় ! বাড়িমুক্তি সবাইকে শিখিয়ে দিয়েচে, সেই থেকে কেউ
আমার অতুলের সঙ্গে কথাটি কয় না । বাছা মুখ চুন করে বেড়ায়
দেখেই ত জিজ্ঞেস করে শুনতে পেলুম । না দিদি, এখানে আমাদের
থাকা চলবে না । এক বাড়িতে থেকে ছেলে আমার অমন মন গুহরে
গুমরে বেড়ালেব্যামোতে পড়বে । তারচেয়ে অন্য কোন স্থানে চলে
যাওয়াই মঙ্গল । তারও হাড় জুড়োয়, আমিও ছুটো নিখেস ফেলে
বাঁচি । বলিয়া ছেলের ছুঁথে নয়নতারার চোখ দিয়া হু'ক্ষোটা জল
গড়াইয়া পড়িল, তাহা সিদ্ধেশ্বরীকেও গলাইয়া দিল । কোন ছেলের
কোন ছুঁখ সহিবার ক্ষমতাই তাহারছিলনা । আঁচলদিয়া মেজবৈর
চোখের জল মুছাইয়া দিয়া সিদ্ধেশ্বরী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন ।
নিঃশব্দে এতবড় কঠিন শাস্তি দিবার এত সহজ কৌশল যে সংসারে
থাকিতে পারে তাহা তিনি কল্পনা করিতেও পারিতেন না । দীর্ঘনিশ্চাস
ফেলিয়া বলিলেন, বাছা রে ! বাড়িতে কেউ কি অতুলের সঙ্গে কথা
কয় না, মেজবৈ ?

নয়নতারা একটা দীর্ঘনিশ্চাসফেলিয়া বলিল, জিজ্ঞেস করেই দেখ
না দিদি ।

হরিচরণকে সেইখানে ডাকাইয়া আনিয়া সিঙ্কেশ্বরী প্রশ্ন করিমেন। হরিচরণ তেজের সহিত তৎক্ষণাত জবাব দিন, ও ছোট-লোকটার সঙ্গে কে কথা কইবে, মা? বড়দাকে যা মুখে আসে তাই বলে; ছোটখুঁড়ীমাকে গালাগালি দেয়!

সিঙ্কেশ্বরী ঠাণ্ডা প্রত্যন্তর করিতে পারিলেন না। একটু পরে কহিলেন, যা হয়ে গেছে তায় আর উপায় কি হরি; যাও, ডেকে কথা কও গো।

হরিচরণ মাথা নাড়িয়া বলিল, ওর কথা বলবার ভাবনা নেই মা পাঢ়ার আস্তাবলে অনেক গাড়োয়ান আছে সেইখানে যাক, চের শঙ্খবাঞ্চব জুটে যাবে।

নয়নতারা জলিয়া উঠিয়া বলিল, তোর মুখও ত নেহাত কম নয় হরি; তুই এমন কথা আমাদের বলিস! আচ্ছা, সেই ভাল! আমরা গাড়োয়ানদের সঙ্গেই মেলামেশা করতে যাব। ওঠো দিদি, জিনিস-পত্রগুলো চাকরটা বেঁধেছেই নিক্।

হরিচরণ মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, অতুল সকলের সম্মুখে দাঢ়িয়ে কান মলবে, নাকখত দেবে, তবে আমরা কথা ক'ব। তা নইলে ছোটখুঁড়ীমা—না মা, সে আমরা কেউ পারব না। বলিয়াই আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষানাকরিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সিঙ্কেশ্বরী বিমর্শ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

মেজবো যৃহৃকষ্টে কহিল, ছোটবো একবার যদি ছেলেদের ডেকে বলে দেয়, তা হলে সমস্ত গোলাই মিটে যায়।

সিঙ্কেশ্বরী ধৌরে ধৌরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তা যায়।

মেজবো কহিল, তবেই দেখ দিদি। এইসব ছেলেরা বড় হয়ে তোমাকে মানবে, না ভালবাসবে? বলা যায় না। ভবিষ্যতের কথা— নিজের ছেলেমেয়েরা তোমার পর হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমার অতুল-টুলকে তোমরা যে যাই বল, তাদের মা-অস্ত প্রাণ। আমি বললে, সাধ্য কি তার এমন করে ঘাড় নেড়ে তেজ করে বেরিয়ে যায়। এতটা

বাড়াবাড়ি কিন্তু ভাল নয় দিদি ।

সিঙ্গেখরী এত কথায় বোধ করি মন দিতে পারেন নাই ; নিরীহ-
ভাবে জ্বাব দিলেন, তা বটে । এ বাড়ির মণি থেকে পটল পর্যন্ত
সবাই ঐ শৈলের বশে । সে যা বসবে যা করবে, তাই হবে—কেউ
আমাকে মানেও না ।

এটা কি ভাল ?

সিঙ্গেখরী মুখ তুলিয়া বলিলেন, কোন্টা !—ওরে ও মৌলা, তোর
খুড়ীমাকে একবার ডেকে দে ত মা ।

মৌলা কি কাজে এইদিকে আসিতেছিল, ফিরিয়া গেল ।
নয়নতারা আর কথা কহিল না, সিঙ্গেখরীও উৎসুকভাবে অপেক্ষা
করিয়া রহিলেন ।

শৈলজা ঘরে ঢুকিতে না ঢুকিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন,
জিনিসপত্র বাঁধা হয়েছে—এরা তবে চলে যাক ?

শৈল কিছুই জানিত না, একটু ভীত হইয়া কহিল, কেন ?

সিঙ্গেখরী বলিলেন, তা বৈ কি—কি পাষাণ আগ তোর শৈল !
তোর ছক্কুমে কেউ অঙ্গুলের সঙ্গে খেলা করে না, কথাবার্তা পর্যন্ত কয়
না—কি করে বাছার দিন কাটে, শুনি ? আর নিজের ছেলের
দিবারাত্রি শুকনো মুখ দেখে বাপ-মাই বা কেমন করে এখানে বাস
করে ? তুই এদের তা হলে এ বাড়িতে রাখতে চাসনে বল ?

নয়নতারা চিমাটি কাটিয়া কহিল, তা হলে হ্যাত সবদিকেই ছোট-
ধৌর হয় ভাল ।

শৈলজা এ কথা কানে তুলিল না । সিঙ্গেখরীকে কহিল, অমন
ছেলের সঙ্গে আমি বাড়ির কোনও ছেলেকেই খিশতে দিতে পারিনে
দিদি । ও যে কি মন্দ হয়ে গেছে, তা মুখে বলা যায় না ।

নয়নতারা আর সহ করিতে পারিল না । কৃক্ষ সর্পিণীর মত মাধা
তুলিয়া গঞ্জিয়া উঠিল—হতভাগী, মাঝের মুখের সামনে তুই অমন
করে ছেলের নিম্নে করিস । দুর হ আমার ঘর থেকে । মুখ ফেন
তোর খসে যায় ।

আমি ইচ্ছে করে কথন তোমার ঘর মাড়াই নে মেজদি। কিন্তু তুমি এমনি করেই ছেলের মাথাটি খেয়ে বসে আছ। বলিয়া শৈল শাস্তিবাবে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সিদ্ধেখরী বহুকণ পর্যন্ত বিহুলের মত বসিয়া রহিলেন। কি করিবেন, কি বলিবেন, কিছুতেই যেন ভাবিয়া পাইলেন না।

নয়নতারা সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাদের মায়া-মমতা ত্যাগ কর দিদি, আমরা সরে যাই। এবং মাঝের পেটের ভাই বলেই তুমি এমন করে আমাদের টেনে বেড়াচ ; কিন্তু ছোটবোর এতটুকু ইচ্ছে নয়—আমরা এ বাড়িতে থাকি।

সিদ্ধেখরী এ কথার জবাব না দিয়া বলিলেন, ওরা যা বলচে, অচুল কেন তাই করুক না। সেও ত ভাল কাজ করেনি মেজবো !

আমি কি বলচি—সেভালকাজ করেচে দিদি ? জ্ঞানবুদ্ধি থাকলে কেউ কি বড়ভাইকে গালাগালি দেয় ! আচ্ছা, আমি তার হয়ে তোমাদের সকলের পায় নাকখত দিচ্ছি, বলিয়া নয়নতারা মাটিতে সজোরে নাক ঘষিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, তাকে তোমরা মাপ করো দিদি, তার মুখ দেখে বুক আমার ফেটে যাচ্ছে—বলিয়া নয়নতারা আর একবার বোধ করি মাটিতে নাকঘষিতে যাইতেছিল—সিদ্ধেখরী হাত বাড়াইয়া ধরিয়া ফেলিয়া নিজেও চোখ মুছিলেন।

ছপুরবেলা রাখাঘরে বসিয়া সিদ্ধেখরী অনেক বলিয়া কহিয়া, অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াও শৈলকে রাজী করাইতে নাপারিয়া রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, তোর মনের কথা খুলেই বল না শৈল, মেজবোরা চলেযাক।

প্রত্যুভরে শৈল মুখ তুলিয়া একবার চাহিল মাত্র। সে চাহিল সিদ্ধেখরীকে অধিকতর ত্রুট্য করিয়া দিল ; বলিলেন, আপনার মার পেটের ভাইকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমাদের নিয়ে থাকি, আর লোকে আমাদের মুখে চুনকালি দিক। আমার সংসারে বনিয়ে না চলতে পার, যেখানে স্বৰিধে হয়, সেইখানে তোমরা চলে যাও—আমি আর পারিনে। ওদের চেয়ে তোমরা ত বাপু আমার বেশী আপনার

নও। বলিয়া সিঙ্কেখৰী টাটিয়া দাঢ়াইলেন। বোধ কৰি, তাহাৰ মনে মনে আশা ছিল, এইবাৰ শৈলজা নৱম হইয়া আসিবে। কিন্তু মে যখন একটা কথাৰও জ্বাব না দিয়া নিঃশব্দে নিজেৰ মনে হাতা-বেড়ি নাড়িয়া চাড়িয়া রাখা কৱিতেই লাগিল, তখন তিনি যথাৰ্থই মহাকোষভৱে অগ্যত্ব চলিয়া গেলেন।

ঢুপুৱবেলা বড়কৰ্তা আহাৰে বসিলে, সিঙ্কেখৰী পাখাৰ বাতাস কৱিতে কৱিতে ঢঃখে অভিমানে পরিপূৰ্ণ হইয়ামেই কথাই তুলিলেন; কহিলেন, মেজবৌদেৱ আৱ ত এ বাড়িতে থাকা পোষায় না দেখছি। আজ সকাল খেকেই তাৰেৱ জিনিসপঞ্চ বাঁধাৰ্বাধি হচ্ছে।

গিৱীশ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা কৱিলেন, কেন ?

সিঙ্কেখৰী বলিলেন, তা বৈ কি ! এমনি ত ছোটবৌয়েৱ সঙ্গে এক তিলার্ধ বনে না, তাৱ ওপৰ ছোটবৌ বাড়িতে সব ছেলেকে শিখিয়ে দিয়েছে—কেউ অতুলেৱ সঙ্গে কথা কয় না। সে বেচোৱা এই ক'দিনে শুকিয়ে যেন অর্ধেক হয়ে গেছে—

এই সময়ে শৈলজা দুধেৱ বাটি-হাতে দোৱণোড়ায় আসিয়া দাঢ়াইল এবং কাপড় চোপড় আৱ একবাৰ ভাল কৱিয়া সামলাইয়া লইয়া তিৰেচুকিয়া পাতেৱ কাহে বাটি রাখিয়া দিয়া বাহিৰ হইয়াগেল।

সিঙ্কেখৰী তাহাকে শুনাইয়া বলিলেন, এইষেছোটবৌ—বলিয়াই জন্ম কৱিলেন, শৈল নিজেৱ নাম শুনিয়া অনুযালে সৱিয়া দাঢ়াইল।

ও-পক্ষেৱ দোষ যতই হোক, অতুল ও তাহাৱ জননৌৱ ঢঃখে সিঙ্কেখৰীৰ মাতৃহৃদয় বিগলিত হইয়া গিয়াছিল। কোনমতে একটা মিটমাট হইলেই তিনি বাঁচেন। কিন্তু শৈল কিছুতেই বাগমানিতেছে না দেখিয়া তাহাৱ শ্ৰীৱ জলিয়া যাইতেছিল। তাই আজ তাহাকে শাস্তি দিতেই তিনি কোমৰ বাঁধিয়াছিলেন ; বলিলেন, এই যে শৈল এখন খেকেই ভায়ে ভায়ে অসন্তোষ কৱে দিচ্ছে, বড় হলে এৱা ত লাঠালাঠি মাৰামাৰি কৱে বেড়াবে—এটা কি ভাল ?

কৰ্তা ভাতেৱ গ্রাম মুখে পুৱিয়া বলিলেন, বড় খাৱাপ।

সিক্ষেক্ষণী বহিতে লাগিলেন, ওর জন্মেই ত মণি অতুলকে অমন
করে ঠ্যাঙ্গালে। আচ্ছা সে-ও মেরেচে, ও-ও গাল দিয়েছে—চুকে-
বুকে গেল, আবার কেন! আবার কেন ছেলেদের কথা কইতে নিষেধ
করে দেওয়া? আজ তুমি মণি হরিকে ডেকে বলে দিয়ো—তারা
যেন অতুলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, নইলে ওরা চলে গেলে যে
পাড়ার লোকে আমাদের মুখেচুনকালিদেবে। সত্যিই ত আর ছোট-
বৌয়ের জন্মে মায়ের পেটের ভাই-ভাজকে তুমি ছাড়তে পারবে না।

তা ত নয়ই, বলিয়া তিনি আহার করিতে লাগিলেন।

আচ্ছা, ছোটটাকুরপো কি কোনদিনই কিছু বোজগার করবার
চেষ্টা করবে না? এমনি করেই কি চিরটা কাল কাটবে?

স্বামীর প্রসঙ্গ উত্থিত হইবামাত্রই শৈলজা কানে হাত দিয়া
ক্রতৃপদে নিঃশব্দে ঔচ্ছান বরিল। বর্ত: কিজবাব দিলেন, তাহাঙ্গনিবার
জন্ম অপেক্ষা করিতে পারিল না। কান পাতিয়া এইসকল প্রসঙ্গ সে
কোনদিন শুনিত না এবং শুনিতে ইচ্ছাও করিত না। কারণ, তাহার
মনে মনে যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল, তাহার স্বামীর সম্বন্ধে আলোচনা
অপ্রিয় ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। অথচ সত্যকে সে আজীবন
ভালবাসিত। তাহা অপ্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক বলিতে বা শুনিতে
কোনদিনই মুখ ফিরাইত না। কিন্তু স্বামীর সম্বন্ধে কেমন করিয়া যে
সে তাহার স্বভাবটিকে ভজন করিয়া গিয়াছিল তাহা বলা সুকৃতিন।

পঁচ

সিদ্ধেশ্বরী যত বড় ক্রোধের উপরেই স্বামীর কাছে নালিশ করিতে শুরু করুন, শৈলকে অতপদে প্রস্তান করিতে দেখিয়া তাহার চৈতন্য হইল—কাজটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইয়া গেল ! স্বামী সইয়া খোটা দিলে শৈলের হৃঢ় এবং অভিমানের অবধি ধাক্কিত না তাহা তিনি জানিতেন।

ত্রীকে চুপ করিয়া যাইতে দেখিয়া কর্তা মুখ তুলিয়া চাহিলেন ; এবং কহিলেন, আমি বেশ করে ধরকে দেব'খন । বলিয়া আহার সমাধা করিয়া পান চরণ করিবার সময়টুকুর মধ্যেই সমস্ত বিশ্বত হইয়া গেলেন ।

বন্ধুত্ব : গিরীশের স্বতাবটা অস্তুত রকমের ছিল । আদালত মোকদ্দমা ব্যতীত কিছুই তাহার মনে স্থান পাইত না । বাটীর মধ্যে কি ঘটিতেছে, কে আসিতেছে, কে যাইতেছে, কি ধরচ হইতেছে, ছেলেরা কি করিতেছে, কিছুই তিনি তত লইতেন না । টাকা রোজগার করিতেন এবং ভালোমন সব কথাতেই সায় দিয়া, যা হোক একটা মতামত প্রকাশ করিয়া কর্তব্য সম্পাদন করিতেন ।

সুতরাং ‘ধরকে দেব’খন’ বলিয়া কর্তা যখন কর্তার কর্তব্য শেষ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন, তখন সিদ্ধেশ্বরী কথাও কহিলেন না ; কাহাকে ধরকাইবেন—কেন ধরকাইবেন—জিজ্ঞাসাও করিলেন না ।

নয়নতারা পাশের ঘরে আড়ি পাতিয়া সমস্ত শুনিতেছিল, ভাণ্ডর এবং বড়জায়ের মন্তব্য শুনিয়া পুলকিত-চিত্তে প্রস্তান করিল । কিন্তু মিনিট কয়েক পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, অমন করে বসে কেন দিদি, বেলা হ'ল, যা হোক চাউ মুখে দেবে চল ।

সিদ্ধেশ্বরী উদাসভাবে বলিলেন, বেলা আর কোথায়—এই ত সবে এগারোটা ।

এগারোটা কি সোজা বেলা দিদি ? তোমার এই অস্তু শরীরে যে বেলা ন'টাৰ মধ্যেই ধাওয়া দৱকার ।

সিদ্ধেশ্বরীর এখন থাওয়া-দাওয়ার কথাবার্তা কিছুই ভাল লাগিডে-
ছিল না। বলিলেন, তা হোক মেজবৌ, আমি কোনদিনই এত
শিগগির খাইনে—আমার একটু দেরি আছে।

নয়নতারা ছাড়িল না, কাছে আসিয়া হাত ধরিল। কর্তৃরে উৎকর্ষ
চালিয়া দিয়া কহিল, এইজন্যেই ত পিত্তি পড়ে দেহের এই আকার।
আমার হাতে হেসেল থাকলে আমি ন'টা পেরুতে দিই ? তুমি না
বাঁচলে কার আর কি দিদি, আমাদেরই সর্বনাশ। নাও চল, যা হোক
হুটো তোমাকে খাইয়ে দিয়ে একটু সুস্থির হই।

নয়নতারা এক মাসের অধিককাল এখানে আসিয়া আছে ; এবং বড়-
জায়ের জন্য প্রত্যহ এই দাক্কণ অঙ্গুরতা ভোগ করা সত্ত্বেও কেন যে
এতদিন নিজেকে সুস্থির করিবার চেষ্টা করে নাই, সিদ্ধেশ্বরী মনে মনে
তাহার কারণ বুঝিলেন। কিন্তু কৈতুবাদের এমনি মহিমা, সমস্ত
বুঝিয়াও, আজ্ঞ'চিত্তে কহিলেন, তুমি আপনার জন বলেই এ কথাটি
আজ বললে, মেজবৌ ; নইলে কে আর আমার আছে বল !

নয়নতারা হাত ধরিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে রাখাঘরে লইয়া গেল এবং
নিজের হাতে ঠাই করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া, বামুনঠাকুরনের
দ্বারা ভাত বাঢ়াইয়া আপনি সম্মুখে ধরিয়া দিল।

নিরামিষ দিকের রাখা শৈলজা রঁধিত। মেজবৌ নীলাকে ডাকিয়া
কহিল, তোর ছোটখূঢ়াকে বল গে ও-হেসেলে কি আছে এনে দিতে।

মিনিট-খানেক পরে শৈল আসিয়া তরকারি প্রভৃতি সিদ্ধেশ্বরীর
পাতের কাছে রাখিয়া দিয়া নীরবে বাহির হইয়া ষাইতেছিল—তিনি
মেজজাকে লক্ষ্য করিয়া রোগীর কঠে চি' চি' করিয়া প্রশ্ন করিলেন,
তোমরা এইসঙ্গে কেন বসলে না মেজবৌ।

মেজবৌ কহিল, আমরা ত আর তোমার মত মরতে বসিনি দিদি।
তুমি খেয়ে ওঠো, আমি তোমার পাতেই বসব। শৈলজা প্রতি
কটাক্ষে চাহিয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চরে কহিল, না দিদি, আমি

বেঁচে থাকতে কিন্তু আমাদের ফাঁকি দিয়ে তোমাকে পালাতে দেব না। তা বলে দিচ্ছি। একটুখানি চুপ করিয়া, ছোটবোৰ কত দূৰে আছে দেখিয়া লইয়া কহিল, এবা হ'জনে যেমন সহোদৱ, আমৱাওতভেমনি ছুটি বোন। যেখানে যতদূৰেই থাকি না কেন দিদি, আমি যত নাড়ীৰ টানে তোমাৰ জন্মে কেঁদে মৱব, আৱ কি কেউ ভেমন কৱে কানবে ? অপৱে কৱবে নিজেৰ ভালোৱ জন্মে, কিন্তু আমি কৱব ভেতৱ খেকে। ভূমি এই ষে বললেদিদি, আমি ছাড়া তোমাৰ আৱকেউ সত্যিকাৱেৱ আপনাৰ জন নেই—এই কথাটি যেন কোনদিন ভুলে যেও না।

সিঙ্কেশ্বৰী বিগলিত-কঠো কহিলেন, এ কি ভোলবাৱ কথা মেজবো ? এতদিন যে তোমাকে চিনতে পাৱিনি তাৱশাস্তি ভগবান আমাকে দিচ্ছেন।

মেজবো চোখেৰ জন আঁচলে মুছিয়া কহিল, শাস্তি যা-কিছু ভগবান যেন আমাকেই দেন, বিদি ! সমস্ত দোষ আমাৱ, আমিই তোমাকে চিনিনি। একটুখানি থামিয়া পুনৰায় কহিল, আজ যবি বা জানতে পেলুম, আমৱা তোমাৰ পায়েৱ ধূলোৱ যোগ্য নই, কিন্তু জানবো সে কথা কি কৱে দিদি ? তোমাৰ কাছে খেকে তোমাৰ সেবা কৱব, ভগবান সে দিন ত আমাকে দিলেন না। আমৱা হয়েচি ষে ছোটবোৰ হ'চক্ষেৱ বিষ।

সিঙ্কেশ্বৰী উদ্বৃগ্ন হঠে বসিয়া উঠিলেন, তা হলে সে যেন তাৱ ছেলেপিলে নিয়ে দেশেৰ বাড়িতে গিয়ে থাকে। আমি তাৱ সাতগুষ্টিকে ছুধেভাতে থাওয়াৰ কি নিজেৰ সৰ্বনাশ কৱবাৰ জন্মে ? খুড়তুত ভাই, ভাজ, তাদেৱ ছেসেপুলে—এই সম্পর্ক। দেৱ থাইয়েছি, দেৱ পরিয়েচি—আৱ না ; দাসী-চাকৱেৱ মত মুখ বুজে আমাৱ সংসাৱ থাকতে পাৱে থাক, না হয় চলে যাক।

অদূৰে চৌকাঠ ধৱিয়া শৈল দীঢ়াইয়াছিল, সিঙ্কেশ্বৰী তাহা ঘৰেও মনে কৱেন নাই। হঠাৎ তাহাৰ আঁচলেৱ চওড়া লাল পাড়টা অদীপ্ত অগ্ৰৱেৰোৱ মত সিঙ্কেশ্বৰীৰ চোখেৱ উপৰ জলিয়া উঠিতেই ; তিনি গলা

বাড়াইয়া দেখিলেন, ঠিক পাশের কবাটের চৌকাঠ ধরিয়া সে স্তন্ধভাবে দাঁড়াইয়া এতক্ষণের সমস্ত কথোপকথন শুনিতেছে। চক্ষের পলকে ভয়ে তাহার আহারের রুচি চলিয়া গেল; এবং এই মেজবৌকে তাহার সমস্ত আঘাতার সহিত বিলুপ্ত করিয়া দিয়া তিনি আর কোথাও ছুটিয়া পালাইতে পারিলেই যেন এ যাত্রা রক্ষা পান—তাহার এমনি মনে হইল।

মেজবৌ মহা উদ্বিগ্নস্বরে কহিল, ও কি দিদি, শুধু হাত নাড়—খাচ না যে ?

সিদ্ধেশ্বরী রূদ্ধকর্ণে শুধু বলিলেন, না।

মেজবৌ কহিল, আমার মাথা খাও দিদি, আর দুটি খাও—
তাহার কথাটা শেষ না হইতেই সিদ্ধেশ্বরী জলিয়া উঠিয়া বলিলেন, কেন যিছে কতকগুলো বকচ মেজবৌ, আমি খাব না—
যাও তুমি আমার স্মৃতি থেকে, বলিয়া সহসা ভাতের থালাটা ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া গেলেন।

নয়নতারা হাঁ করিয়া কাঠের পুতুলের মত চাহিয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। কিন্তু বিহুল হইয়া নিজের ক্ষতি করিবার লোক সে নয়। সিদ্ধেশ্বরী উঠিয়া গিয়া যেখানে মুখ ধুইতে বসিয়াছিলেন, তথায় গিয়া সে তাহার হাত ধরিয়া বিনীতকর্ণে কহিল, না জেনে অন্যায় যদি কিছু বলে থাকি দিদি, আমি মাপ চাইচি। তুমি রোগা শরীরে উপোস করে থাকলে, আমি সত্ত্ব বলচি, তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।

সিদ্ধেশ্বরী নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হইয়াছিলেন। ফিরিয়া গিয়া যা পারিলেন নৌবে আহার করিয়া উঠিয়া গেলেন।

কিন্তু নিজের ঘরে বসিয়া অত্যন্ত বিমর্শ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আজ এত ব্যথা তিনি শৈলকে দিলেন কি করিয়া? এবং ইহার অনিবার্য শাস্তিস্বরূপ সে যে এইবার তাহার সেই অতি কঠোর উপবাস শুরু করিয়া দিবে ইহাতেও তাহার অগুমাত্র সংশয় রহিল

না। স্বতরাং ছপুরবেলা নৌলাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিতে পাইলেন, খুড়ীমা ভাত খাইতে বসিয়াছেন, তখন তাহার আহ্লাদ কর্তৃক হইল বলা যায় না, কিন্তু বিশ্বায়ের আর অবধি রহিল না। শৈল তাহার চিরদিনের স্বভাব অভিক্রম করিয়া কি করিয়া যে অকস্মাত এমন শান্ত এবং ক্ষমতাশীল হইয়া উঠিল তাহা কোনমতেই তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

গিরীশ এবং হরিশ দুই ভাই আদালত হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যার সময় একত্রে জল খাইতে বসিলেন। সিদ্ধেশ্বরী অদূরে ঘানমুখে বসিয়া ছিলেন—আজ তাহার দেহ-মন কিছুই ভালো ছিল না।

গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়াই গিরীশের সকালের কথা স্মরণ হইল। সব কথা মনে না হোক, রমেশকে বকিতে হইবে—তাহা মনে পড়িল। দ্বারের কাছে নৌলা দাঢ়াইয়া ছিল—তৎক্ষণাত আদেশ করিলেন, তোর ছোটকাকাকে ডেকে আন নৌলা।

সিদ্ধেশ্বরী উৎকৃষ্টিত হইয়া বলিলেন, তাকে আবার কেন?

কেন? তাকে রীতিমত ধরকে দেওয়া দরকার। বসে বসে সে যে একেবারে জানোয়ার হয়ে গেল।

হরিশ ইংরাজী করিয়া বলিলেন, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।

সিদ্ধেশ্বরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, না—না, বৈঠান, তুমি তাকে আর প্রশ্ন দিয়ো না—সে আর ছেলেমাহুষটি নয়।

সিদ্ধেশ্বরী জবাব দিলেন না, ঝষ্টমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

রমেশ তখন বাটীতেই ছিল—দাদার আহ্লানে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঢ়াইল। গিরীশ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন, অভুলের সঙ্গে তুই ঝগড়া করেচিস কেন?

রমেশ আশচর্য হইয়া বলিল, ঝগড়া করেচি?

গিরীশ ক্রুক্ককষ্টে কহিলেন, আলবাত করেচিস। বলিয়া গৃহিণীর

প্রতি চাহিয়া বলিলেন, বড়গিন্নী বলছিলেন, তুই যা মুখে আসে, তাই
বলে তাকে গালমন্দ করেচিস। ও কি আমাকে মিথ্যা কথা বললে ?
রমেশ অবাক হইয়া সিদ্ধেশ্বরীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী গঞ্জিয়া উঠিলেন, তোমার কি ভৌমরতি ধরেচে ? কখন
তোমাকে বললুম ছোটঠাকুরপো অতুলকে গালমন্দ করেছে ?

হরিশ ভ্রম সংশোধন করিয়া ধৌরে ধৌরে কহিলেন, না—না, সে
ছোটবৌমা।

তখন গিরীশ বলিলেন, ছোটবৌমাই বা কেন গালমন্দ করবেন
শুনি ?

সিদ্ধেশ্বরী তেমনি সক্রোধে অস্থীকার করিয়া কহিলেন, সেই বা
কেন অতুলকে গালমন্দ করবে। সেও করেনি। আর যদি করেই থাকে,
তাকে বলব আমি। তুমি ছোটঠাকুরপোকে খোচা দিচ্ছ কেন ?

গিরীশ কহিলেন, আচ্ছা, তাই যেন হ'লো, কিন্তু তুই হতভাগা
এমনি অপদার্থ যে, খড়ের দালালি করে আমার চার-চার হাজার
টাকা উড়িয়ে দিলি, আর দেখ গে যা বাগবাজারের খাঁ-দের। এই
খড়ের দালালিতে ক্রোড়পতি হয়ে গেল।

হরিশ আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, খড়ের দালালি ?

রমেশ কহিল, আজ্ঞে না, পাটের।

গিরীশ রাগিয়া বলিলেন, তারা আমার মক্কেল—আমি জানিনে,
তুই জানিস ! খড়ের দালালি করেই তারা বড়লোক। বিলাতে
জাহাজ-জাহাজ খড় পাঠাচ্ছে।

হরিশ এবং রমেশ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল।

গিরীশ তাহাদের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, আচ্ছা, নাহয় পাটই
হলো। এই পাটের দালালি করে তুই কি দু'শ একশও করে আনতে
পারিস নে ? তোমাদের আমি ত চিরকালটা বসে বসে খাওয়াতে
পারব না ! যে মাটিতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে'। একবার চার
হাজার গেছে—গেছেই। কুচ পরোয়া নেই—আর চার হাজার দাও।

না হয়, আরো চার হাজার দাও। তা বলে, আমি থেটে মরব, আঁকড়ে
ভূমি বসে বসে থাবে ?

হরিশ মনে মনে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট হইয়া মৃহুস্বরে কহিলেন, সব
কাজ শিখতে হয় ; নইলে পাটের দালালি ত করলেই হয় না ! বাব
বাব এই টাকা নষ্ট করা ত ঠিক নয় ।

গিরীশ তৎক্ষণাত সায় দিয়া বলিলেন, নয়ই ত। আমি পাটের
দালালি-টালালি বুঝিনে, তোমাকে খড়ের দালালি কাল থেকে শুরু
করতে হবে। সকালে আমি ব্যাঙ্গের ওপর আট হাজার টাকার চেক
দেব। চার হাজার টাকার খড় কিনবে, চার হাজার টাকা জমা
থাকবে। এটা নষ্ট হলে তবে ও-টাকায় হাত দেবে। তার আগে নয়।
বুঝলে ? আমি তোমাদের বসে বসে থাওয়াতে পারব না—যাও।

রমেশ নৌরবে চলিয়া গেলে হরিশ মাথানাড়িতে নাড়িতে বলিলেন,
এই অঁট হাজার টাকাই জলে গেল ধরে রাখুন। কি বল বৌঠান ?

সিদ্ধেশ্বরী চুপ করিয়া রহিলেন। জবাব না পাইয়া হরিশ দাদার
দিকে চাহিয়া কহিলেন, টাকাটা কি সত্যিই ওকে দেবেন নাকি ?

গিরীশ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সত্যি কি রকম ?

হরিশ বলিলেন, এই সেদিন চার হাজার টাকা জলে দিলে,
আবার আট হাজার সেই জলেই ফেলতে দেবেন, এ যেন আমি
ভাবতেই পারিনে ।

গিরীশ কহিলেন, তা হলে ভূমি কি রকম করতে বল ?

হরিশ বলিলেন, রমেশ ব্যবসা-বাণিজ্যের জানে কি দাদা ? আট
হাজার দিন, আর আট লাখই দিন, আটটা পয়সাও ফিরিয়ে আনতে
পারবে না—আমি বাজি রেখে বলতে পারি। এই টাকাটা উপার্জন
করে জমাতে কত সময় লাগে একবার ভেবে দেখুন দেখি !

গিরীশ তৎক্ষণাত সায় দিয়া বলিলেন, ঠিক ঠিক, ঠিক বলেচ।
ওকে টাকা দেওয়া মানেই জলে ফেলা, ঠিক ত। ও কি আবার একটা
মানুষ ?

হরিশ উৎসাহ পাইয়া কহিতে লাগিলেন, তার চেয়ে বরং একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নিয়ে করুক। যার যেমন ক্ষমতা তার তেমনই করা উচিত। এই যে ছেলেদের পড়াবার জন্যে আমাকে মাসে ২৫ টাকা মাস্টারকে দিতে হচ্ছে, এ কাজটাও ত ওর দ্বারা হতে পারে। সেই টাকাটা সংসারে দিয়েও আমাদের কৃতক সাহায্য করতে পারে। কি বল বৌঠান ?

কিন্তু বৌঠান জবাব দিবার পূর্বেই গিরীশ খুশী হইয়া বলিলেন, ঠিক, ঠিক কথা বলেচ হরিশ। কাঠবিড়াল নিয়ে রামচন্দ্র সাগর বেঁধেছিলেন যে। স্তীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, দেখেচ বড়বো, হরিশ ঠিক ধরেছে। আমি বরাবর দেখেচি কিনা ছেলেবেলা খেকেই ওর বিষয়-বুদ্ধিটা ভারী প্রথর। ভবিষ্যৎ ও যত ভেবে দেখতে পারে এমন কেউ নয়। আমি ত আর একটু হলেই এতগুলো টাকা নষ্ট করে ফেলেছিলাম। কাল খেকেই রমেশ ছেলেদের পড়াতে আরম্ভ করে দিক। খবরের কাগজ নিয়ে সময় নষ্ট করবার দরকার নেই।

সিঙ্কেশ্বরী বলিলেন, টাকাটা কি তবে দেবে না নাকি ?

নিশ্চয় না। তুমি বল কি, আবার নাকি আমি টাকা দিই তাকে ?

তবে এমন কথা বলাই বা কেন ?

হরিশ কহিলেন, বললেই যে দিতে হবে তার কোন মানে নাই বৌঠান। আমিও ত দাদার সহোদর, আমারও ত একটা মতামত নেওয়া চাই ! সংসারে টাকা নষ্ট হলে আমারও ত গায়ে লাগে !

সেইটেই তোমার আসল কথা ঠাকুরপো, বলিয়া সিঙ্কেশ্বরী রাগ করিয়া উঠিয়ে গেলেন।

সিদ্ধেশ্বরীর সেবার ভাব নয়নতারা গ্রহণ করিয়াছিল। সে সেবা এমনি নিরেট, এমনি ভরাট যে, তাহার কোন এতটুকু কাঁক দিয়া আর কাহারও কাছে ঘেঁষিবার জো ছিল না। সিদ্ধেশ্বরী এমন সেবা তাঁর এতখানি বয়সে কখনও কাহারও কাছে পান নাই। তবুও কেন যে তাঁহার অশাস্ত্র মন অমুক্ষণ শুধু ছল ধরিয়া কলহ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল এ বহুজ্ঞ জানিত শুধু অন্তর্যামী। সেদিন সকালে সিদ্ধেশ্বরী ছয়মাসের রোগীর মত টলিয়া টলিয়া রাম্ভাষরের বারান্দায় আসিয়া ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। একটা দীর্ঘনিশ্চাস ফেলিয়া আন্ত-চৰ্বলকঠে, বোধ করি বা স্মৃথের দেয়াল-টাকেই উপলক্ষ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনার জন বটে মেজবৈ, সে না থাকলে আমাকে দেখচি বেঘোরে মরতে হয়। এমনি সেবায়জ্ঞ আমার মায়ের পেটের বোন থাকলে করতে পারত না।

শৈল ঘরের ভিতরে রঁধিতেছিল, সমস্তই শুনিতে পাইল। এই কয়টা দিন সে বড়জায়ের ঘরেও যায় নাই, তাঁহার সঙ্গে কথাও কহে নাই। এখনও চুপ করিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী পুনরায় শুরু করিলেন, আর অপরকে খাওয়ানো-পরানো শুধু অধর্মের ভোগ—ভস্যে ঘি ঢালা। অসময়ে কোন কাজেই আসে না। আর এই আমার মেজবৈ। মুখের কথাটি খসাতে হয় না, হাঁ-হাঁ করে এসে পড়ে। আমি হেঁটে গেলে তার বুকে বাঁজে। আমার পোড়া কপাল যে, এমন মাহুষকেও আমি পরের ভাঙচি শুনে পর মনে করেছিলুম।

শৈলর চুড়ির শব্দ, হাতা-বেড়ি নাড়ার শব্দ সবই তাঁহার কানে আসিতেছে। এত কাছে ধাকিয়াও সে যখন এতবড় মিথ্যা অভিযোগের কোন জবাব দিল না, তখন আর তাঁহার অধৈর্যের সীমা রহিল না।

ତାର ଚିଚି କଷ୍ଟସର ଏକମୁହୂର୍ତ୍ତେଇ ପ୍ରବଳ ଓ ସତେଜ ହଇଯା ଉଠିଲ ; ମାୟେର କାଛ ଥେକେ ଏକଥାନା ଚିଠି ଏମେଚେ ତା ଯେ କାଳକେ ଦିଯେ ଏକଟୁଖାନି ପଡ଼ିଯେ ଶୁନବ, ଆମାର ସେ ଜୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ । ପରକେ ଥାଓୟାନ-ପରାନ ଆମାର କିସେର ଜୟେ ?

ନୌଲା ଛୋଟଖୁଡ଼ୀର କାଛେ ବସିଯାଇ ତାହାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିତେଛିଲ ; ସେଇଥାନ ହଇତେ କହିଲ, ସେ ଚିଠି ଯେ ମେଜଖୁଡ଼ୀମା ତୋମାକେ ଛ-ତିନବାର ପଡ଼େ ଶୋନାଲେନ ମା ! ଆବାର କବେ ନତ୍ରନ ଚିଠି ଏଲ ?

ତୁଇ ସବ କଥାଯ ଗିଲ୍ଲାପନା କରତେ ଯାସନେ ନୌଲା, ବଲିଯା ମେଯେକେ ଏକଟା ସମକ ଦିଯା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ବଲିଲେନ, ଚିଠି ଶୁନଲେଇ ହ'ଲୋ । ତାର ଜ୍ବାବ ଦିତେ ହବେ ନା ? କେନ ତୋର ଛୋଟଖୁଡ଼ୀ କି ମରେଛେ ଯେ ଆମି ଓ-ପାଡ଼ାର ଲୋକ ଡେକେ ଏନେ ଚିଠିର ଜ୍ବାବ ଲେଖାବ ?

ନୌଲା ଓ ରାଗ କରିଯା ବଲିଲ, ଚିଠି ଲେଖବାର କି ଆର କେଉ ନେଇ ମା, ଯେ ଆଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଦିନଟାଯ ତୁମି ଖୁଡ଼ୀମାକେ ମରିଯେ ଦିଚ ?

ଆଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସେ କଥାଟା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀର ଶ୍ଵରଣ ଛିଲ ନା । ତିନି ଏକ-ମୁହୂର୍ତ୍ତେଇ ଏକେବାରେ ପାଂଶୁ ହଇଯା ବଲିଲେନ, ତୁଇ ଯେ ଅବାକ କରଲି ନୌଲା ! ବାଲାଇ ସାଟ ! ମରବାର କଥା ଆମି ତାକେ ଆବାର କଥନ ବଲଲୁମ ଲା ? ପେଟେର ମେଯେ ଆମାକେ ମୁଖନାଡ଼ା ଦେଯ ! କାଳ ଯାର ବିଯେ ଦିଯେ ଏନେ କୋଲେପିଟେ ମାହୁସ କରଲୁମ, ସେ ଆମାର ଛାଯା ମାଡ଼ାଯ ନା ; ଏତ ଯେ ରୋଗେ ଭୁଗ୍ରି, ତବୁଓ ତ ଆମାର ମରଣ ହୟ ନା ! ଆଜ ଥେକେ ଆର ଯଦି ଏକଫୌଟା ଓସୁଧ ଥାଇ ତ ଆମାର ଅତି ବଡ—

କାନ୍ନାଯ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀର କର୍ତ୍ତରୋଧ ହଇଯା ଗେଲ । ତିନି ଆଁଚଲେ ଚୋଥ ମୁହିତେ ମୁହିତେ ନିଜେର ସରେ ଗିଯା ଏକେବାରେ ମଡ଼ାର ମତ ବିଛାନାଯ ଶୁଇଯା ପଡ଼ିଲେନ ।

ନୟନତାରା ପାଶେର ବାରାନ୍ଦାଯ ଜାନାଲାର ଆଡ଼ାଲେ ଦ୍ବାଡ଼ାଇଯା ସମସ୍ତଇ ଦେଖିତେଛିଲ ; ଏଥନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀର ସରେ ଚୁକିଯା ତାହାର ପାଯେର କାଛେ ଗିଯା ବସିଲ । ଆନ୍ତେ ଆନ୍ତେ ବଲିଲ, ଏକଥାନା ଚିଠିର ଜ୍ବାବ ଦେବାର ଜନ୍ମ ଆବାର ତାର ଖୋଶାମୋଦ କରତେ ଯାଓଯା କେନ

দিদি ! আমাকে হকুম করলেত দশখানা জবাব লিখে দিতে পারতুম ।

সিঙ্কেশ্বরী কথা কহিলেন না ; পাশ ফিরিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়া শুইলেন ।

নয়নতারা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,
তাহলে এখনি কি সেটা লিখে দিতে হবে দিদি ?

সিঙ্কেশ্বরী হঠাৎ রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, তুমি বড় বকাও
মেজবো । বলচি, সে এখন ধাক—সে তুমি পারবে না । তা না—

নয়নতারা রাগ করিল না ! যেখানে কাজ আদায় করিতে হয়,
সেখানে তার ক্রোধ-অভিমান প্রকাশ পাইত না । সে নৌরবে উঠিয়া
গেল ।

বেলা ছুটা-আড়াইটার সময় সিঙ্কেশ্বরী মেঘেকে ডাকিয়া চুপি
চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর খূড়ীমা ভাত খেয়েছে বে ?

নীলা আশ্চর্য হইয়া বলিল, খাবেন না কেন ? বোজ যেমন
খান, তেমনিই ত খেয়েছেন ।

সিঙ্কেশ্বরী ছ' বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন ।

পূর্বেই বলিয়াছি, শৈল চিরকালই অত্যন্ত অভিমানী । সামান্য
কারণেই সে খাওয়া বন্ধ করিত এবং তাই লইয়া সিঙ্কেশ্বরীর যন্ত্রণার
অবধি ছিল না । হাতে ধরিয়া খোশামোদ করিয়া গায়ে মাধায় হাত
বুলাইয়া নানা প্রকারে তাহাকে প্রসন্ন করিতে হইত । অথচ, সেই
শৈল এবার খাওয়া-পরা সম্বন্ধে এত গঞ্জনাতেও কেন যে বিন্দুমাত্র
ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে না, ইহার কোন কারণই তিনি ভাবিয়া ছির
করিতে পারিলেন না । তাহার এই ব্যবহার তাহার কাছে যতই
অপরিচিত এবং অস্বাভাবিক ঠেকিতে লাগিল, ততই তিনি অন্তরের
মধ্যে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিলেন । কোনমতে একটা
প্রকাশ কলহ হইয়া গেলেই তিনি বাঁচেন—কিন্তু তাহার ধার দিয়াও
শৈল যায় না । প্রভাত হইতে রাত্রি পর্যন্ত সে তাহার নির্দিষ্ট কাজ
করিয়া যায় । তাহার আচরণে বাড়ির কেহ কিছুই দেখিতে পায় না ;

শুধু যিনি দশ বছরের মেয়েটিকে বুক দিয়া মানুষ করিয়া আজ এতবড় করিয়া তুলিয়াছেন, তিনিই কেবল ভয়ার্টচিস্টে অনুক্ষণ অনুভব করেন শৈলের চারিপাশের একটা নির্মম ঔদাসিন্যের গাঢ় মেৰ প্রতিদিনই পূজীভূত হইয়া তাহাকে শুধু ঘাপসা ছন্নিৰীক্ষ্য করিয়াই আনিতেছে।

নীলা কহিল, মা, আমি যাই ।

মা জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় শুনি ?

নীলা চুপ করিয়া দাঢ়াইয়া রহিল ।

সিঙ্কেশ্বরী তখন ক্রোধে উঠিয়া বসিয়া, চেঁচাইয়া কহিলেন, কোথায় যেতে হবে শুনি ? ছোটখূড়ীর সঙ্গে তোর এত কি লা যে একদণ্ড আমার কাছে বসতে পারিস না ? বসে থাক পোড়ারমুখী চুপ করে এইখানে । কোথাও তোকে যেতে হবে না । বলিয়া নিজেই ধপ, করিয়া শুইয়া পড়িয়া অন্তদিকে মুখ করিয়া রহিলেন ।

নয়নতারা মৃদু-পদক্ষেপে প্রবেশ করিয়া সম্মেহে অনুযোগের স্বরে কহিল, ছি মা, বড় হয়েচ, ছ'দিন পরে শুশুরঘর করতে চলে যাবো, এখন যে ক'দিন পাও বাপ-মায়ের সেবা করে নাও । মায়ের কাছে বসবে, দাঢ়াবে, সঙ্গে সঙ্গে থেকে ছটো ভালো কথা শিখে নেবে ; এ সময়ে কি যার-তার সঙ্গে সারাদিন কাটানো উচিত ? যাও, কাছে বসে ছ'দণ্ড পায়ে হাত বুলিয়ে দাও, দিদি ঘুমিয়ে পড়ুন । রোগ শরীরে অনেকক্ষণ জেগে আছেন ।

নীলা মেজখূড়ীর প্রতি প্রসন্ন ছিল না । মুখ তুলিয়া উদ্বন্দ্বক্ষে কহিল, বাড়ির মধ্যে যার-তার সঙ্গে আর কার সঙ্গে সারাদিন কাটাই মেজখূড়ীমা ? তুমি কি খূড়ীমার কথা বলচ ?

তাহার কষ্ট আরম্ভ মুখ লক্ষ্য করিয়া নয়নতারা বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিল, আমি কারো কথা বলিনি নীলা, আমি শুধু বলচি, তোমার গোরা মায়ের সেবায়জ্ঞ করা উচিত ।

সিঙ্কেশ্বরী মুখ না ফিরাইয়া বলিলেন, সেবায়জ্ঞ করবে ! আমি ম'লেই বৰঞ্চ ওৱা বাঁচে ।

নয়নতারা কহিল, ভাল, ওই না হয় ছেলেমানুষ, জ্ঞানবুদ্ধি নেই,
কিন্তু ছোটবো ত ছেলেমানুষ নয়! তার ত বলা উচিত, যা নৌলা, তু
মিনিট গিয়ে তোর মাঝের কাছে বোস। না সে নিজে একবার
আসবে, না মেঘেটাকে আসতে দেবে।

নৌলা কি একটা জবাব দিতে গিয়া চাপিয়া গিয়া মুখ ভার
করিয়া দাঢ়াইয়া রইল।

সিদ্ধেশ্বরী মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, তোমাকে সত্যি বলচি মেজ-
বো, আমার এমন ইচ্ছে করে না যে শৈলর আর মুখ দেখি। আমার
যেন সে ছুটি চক্ষের বিষ হয়ে গেছে।

নয়নতারা কহিল, অমন কথা বলো না দিদি। হাজার হোক সে
সকলের ছোট। তুমি রাগ করলে তাদের আর দাঢ়াবারজায়গা নেই,
এ কথাটা ত মনে রাখতে হবে। ভাল কথা। এ মাসে উনি পাঁচ শ
টাকা পেয়েছিলেন, তার খুচরো ক'টাকা নিজের হাতে রেখে বাকী
টাকা তোমাকে দিতে দিলেন; এই নাও দিদি—বলিয়া নয়নতারা
আঁচলের গ্রন্থি খুলিয়া পাঁচখানা নোট বাহির করিয়া দিল।

উদ্বাস-মুখে সিদ্ধেশ্বরী হাত বাঢ়াইয়া গ্রহণ করিয়া বলিলেন, নৌলা,
যা তোর ছোটখুড়ীমাকে ডেকে আন, লোহার সিন্দুকে তুলে রাখুক।

নয়নতারার মুখ কালিবর্ণহইয়া গেল। এইটাকাদেওয়ার ব্যাপারটা
উপলক্ষ করিয়া সে কল্পনায় যে-সকল উজ্জল ছবি আঁকিয়া রাখিয়া-
ছিল, তাহার আগাগোড়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। শুধু যে
সিদ্ধেশ্বরীর মুখে আনন্দের রেখাটি মাত্র ফুটিল না, তাহা নয়; এই
টাকাটা তুলিবার জন্য অবশ্যে এই ছোটবোকেই কিনা ডাক পড়িল
—সিন্দুকের চাবি এখনও তাহারই হাতে! বস্তুতঃ, এই টাকাটা
দেওয়া সম্বন্ধে একটুখানি গোপন ইতিহাস ছিল। হরিশের দিবাৰ
ইচ্ছাই ছিল না, শুধু নয়নতারা মন্ত একটা জটিল সাংসারিক চাল
চালিবার জন্য স্বামীকে নিরস্তুর খোচাইয়া খোচাইয়া ইহা বাহির
করিয়া আনিয়াছিল। এখন সিদ্ধেশ্বরীর এই নিষ্পত্তি আচরণে

এতগুলো টাকা ত জলে গেলই, উপরন্তু রোধে ক্ষোভে তাহার নিজের মাথাটা নিজের হাতে ভাঙিয়া ফেলিবার ইচ্ছা করিতে লাগিল ।

শৈল আসিয়া উপস্থিত হইল । ছয়দিন পরে সে বড়জায়ের মুখের পানে চাহিয়া সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিল, দিদি কি আমাকে ডাকছিলে ?

শৈলের মুখের মাত্র এই ছটি কথার প্রশ্নই সিদ্ধেশ্বরীর কানের মধ্যে অজস্র মধু ঢালিয়া দিল । তিনি চক্ষের পলকে বিগলিতচিত্তে শশব্যস্তে উঠিয়া বলিলেন, হাঁ দিদি, ডাকছিলুম বৈ কি ! অনেকগুলো টাকা বাইরে রয়েছে, তাই নৌলাকে বললুম, যা মা. তোর খূড়ীমাকে একবার ডেকে আন, টাকাগুলো তুলে ফেলুক । এই নাও—বলিয়া তিনি শৈলের প্রসারিত ডান হাতের উপর নোট কয়খানি ধরিয়া দিলেন ।

শৈল অঁচলে-বাঁধা চাবি দিয়া সিন্দুক খুলিয়া ধৌরে-সুস্থে টাকা তুলিতে লাগিল, চাহিয়া চাহিয়া নয়নতারার অসহ হইয়া উঠিল । তথাপি ভিতরের চাঞ্চল্যকোনমতে দমন করিয়া, একটুখানি শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, তাই তোমার দেওর কাল আমাকে বললেন, দিদি, জাঠতৃত-খুড়তৃত ভাই নয়, মায়ের পেটের বড় ভাই । তাঁর খাব না, পরব না ত আর যাব কোথায় ? তবু, মাসে মাসে এমনি পাঁচশ- ছ'শ টাকা করেও যদি দাদাকে সাহায্য করতে পারি ত অনেক উপকার !’ কি বল দিদি ?

সিদ্ধেশ্বরীর হাসিমুখ গন্তীর হইয়া উঠিল । তিনি কোন উত্তর না দিয়া শৈলের পানে চাহিয়া রহিলেন । নয়নতারা বোধ করি তাঁহার গান্তীর্থের হেতু অহুমান করিতে পারিল না । কহিল, শ্রীরামচন্দ্র কাঠবিড়াল নিয়ে সাগর বেঁধেছিলেন । তাই তিনি যথন-তথন বলেন, বড়বৌঠান মুখ ফুটে ঘেন কারো কাছে কিছু চান না ; কিন্তু তাই বলে কি নিজেদের বিবেচনা থাকবে না ? যার যেমন শক্তি, কাজ ক’রে তাকে সাহায্য করা ত চাই । নইলে বসে বসে শুধু গুষ্ঠিবর্গ মিলে থাবো, বেড়াবো, আর ঘুমোবো, তা করলে কি চলে !

তোমারও ত হরিমণির জন্যে কিছু সংস্থান করে যাওয়া চাই !
আমাদের জন্যে সর্বশ উড়িয়ে দিলে ত তোমার চলবে না ! ঠিক
কিনা, সত্যি বল দিদি ?

সিঙ্কেশ্বরী মুখ ভার করিয়া বলিলেন, তা সত্যি বৈ কি !

শৈল সিন্দুক বক্ষ করিয়া শুমুখে আসিয়া সেইচাবিটা তাহার রিং
হইতে খুলিয়া সিঙ্কেশ্বরীর বিছানার উপরফেলিয়া দিয়া নৌরবে চলিয়া
যাইতেছিল, সিঙ্কেশ্বরী ক্রোধে আগুন হইয়া উঠিলেন, কিন্তু আজ্ঞা-
সংবরণ করিয়া তৌক্ষ ধীরভাবে কহিলেন, এটা কি হ'লো ছোটবো ?

শৈল ফিরিয়া দাঢ়াইয়া কহিল, ক'দিন ধরেই ভেবে দেখেছিলুম
দিদি, ও চাবি আমার কাছে রাখা আর ঠিক নয়। অভাবেই
মাঝুষের স্বভাব নষ্ট হয়, আমার অভাব চারিদিকে—মতিভ্রম হতে
কতক্ষণ, কি বল মেজদি ?

নয়নতারা কহিল, আমি ত তোমার কোন কথাতেই নেই ছোট-
বো, আমাকে মিছে কেন জড়াও ?

সিঙ্কেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন, মতিভ্রমটা এতদিন হয়নি কেন, শুনতে
পাই কি ?

শৈল কহিল, একটা জিনিস হয়নি বলে যে কখনো হবে না, তাৰ
মানে নেই। এমনি ত তোমাদের শুধু আমৰা খাচি, পৱচি। না
পারি পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে, না পারি গতৰ দিয়ে সাহায্য
করতে। কিন্তু তাই বলে কি চিরকাল কৰা ভালো ?

সিঙ্কেশ্বরী কুক্ষ রোষে মুখ রাঙ্গা করিয়া কহিলেন, এত ভাল কবে
থেকে হলি লা ? এত ভালমন্দৰ বিচার এতদিন তোদের ছিল
কোথায় ?

শৈল অবিচলিত-স্বরে বলিল, কেন রাগ করে শৰীৰ ধোরাপ কৱচ
দিদি ? তোমারও আৰ আমাদের দিয়ে ভাল লাগচে না, আমার
নিজেৰও আৰ ভাল লাগচে না।

ক্রোধে সিঙ্কেশ্বরীৰ মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

নয়নতারা তাহার হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দিদির না হয় ভাল না
লাগতে পারে, সে কথা মানি, কিন্তু তোমার ভাল লাগচে না কেন
ছোটবো ?

শৈল ইহার জবাব না দিয়াই বাহির হইয়া যাইতেছিল,
সিদ্ধেশ্বরী চেঁচাইয়া ডাকিয়া বলিলেন, বলে যা পোড়ারমুখী, কবে তুই
বিদায় হবি—আমি হরির লুট দেব ! আমার সোনার সংসার বাগড়া-
বিবাদে একেবারে পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে দিলি। মেজবো কি মিছে বলে
যে, কোমরের জোর না থাকলে মানুষের এত তেজ হয় না ? কত-
টাকা আমার তুই চুরি করেচিস, তার হিসেব দিয়ে যা ।

শৈল ফিরিয়া দাঢ়াইল। তাহার মুখ-চোখ অগ্রিকাণ্ডে মত
মৃহূর্তকালের জন্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ; কিন্তু পরক্ষণেই সে মুখ
ফিরাইয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল ।

সিদ্ধেশ্বরী ছিন্ন-শাখার শায় শয্যাতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া
উঠিলেন, হতভাগীকে আমি এতটুকু এনে মানুষ করেছিলুম মেজবো ;
সে আমাকে এমনি করে অপমান করে গেল । কর্তারা বাড়ি আশুন
ওকে আমি উঠানের মাঝখানে ধনি না আজ জ্যান্ত পুঁতি ত আমায়
নাম সিদ্ধেশ্বরী নয় ।

সাত

‘সিদ্ধেখরীর স্বভাবে একটা মারাঞ্চক দোষ ছিল—তাহার বিশ্বাসের মেরুণ্ডগু ছিল না। আজিকার দৃঢ়নির্ভরতা কাল সামাজ্য কারণেই হয়ত শিথিল হইতে পারিত। শৈলকে তিনি চিরদিন একান্ত বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই নয়নতারা যথন অন্তরূপ বুবাইয়া দিল, তখন তাহার সন্দেহ হইতে লাগিল যে, কথাটা ঠিক যে, শৈলর হাতে টাকা আছে, এই টাকার মূল যে কোথায় তাহাও অনুমান করা তাহার কঠিন হইল না। তথাপি সে যে স্বামী-পুত্র লইয়া এই শহর অঞ্চলে স্বতন্ত্র বাসা করিয়া কোন-মতেই থাকিতে সাহস করিবে না ইহাও তিনি জানিতেন।

রাত্রে বড়কর্তা তাহার বাহিরের ঘরে বসিয়া, চোখে চশমা অঁটিয়া, গ্যাসের আলোকে নিবিষ্টচিত্তে জরুরী মকদ্দমার দলিলপত্র দেখিতেছিলেন, সিদ্ধেখরী ঘরে ঢুকিয়া একেবারেই কাজের কথা পাড়িলেন। বলিলেন, তোমার কাজকর্ম করে লাভটা কি, আমাকে বলতে পার ? কেবল শুয়ারের পাল খাওয়াবার জন্যেই কি দিবারাত্রি খেটে মরবে ?

গিরীশের খাওয়ার কথাটাই বোধ করি শুধু কানে গিয়াছিল। মুখ না তুলিয়াই কহিলেন, না, আর দেরি নেই। এইটুকু দেখে নিয়েই চল খেতে যাচ্ছি।

সিদ্ধেখরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, খাওয়ার কথা তোমাকে কে বলচে ! আমি বলচি, ছোটবৌরা যে বেশ গুছিয়ে নিয়ে এবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। এতদিন যে তাদের এত করলে, সব মিছে হয়ে গেল সে খবর শুনেচ কি ?

গিরীশ কৃতকর্তা সচেতন হইয়া বলিলেন, হঁ, শুনেচ বৈ কি। ছোটবৌমাকে বেশ করে গুছিয়ে নিতে বল। সঙ্গে কে কে গেল—মণিকে—মকদ্দমার কাগজাদির মধ্যে অসমাপ্ত কথাটা এইভাবে থামিয়া গেল !

সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধে চেঁচাইয়া উঠিলেন—আমার একটা কথাও কি
তোমার কানে তুলতে নেই ? আমি কি বলচি, আর তুমি কি জবাব
দিচ্ছ ? ছেটবৌরা যে বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে ।

ধর্মক খাইয়া গিরীশ চমকাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
কোথায় যাচ্ছে ?

সিদ্ধেশ্বরী তেমনি উচ্চকষ্টে জবাব দিলেন, কোথায় যাচ্ছে তার
আমি কি জানি ?

গিরীশ কহিলেন, ঠিকানাটা লিখে নাও না ।

সিদ্ধেশ্বরী ক্ষোভে, অভিমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া কপালে করাঘাত
করিয়া বলিতে লাগিলেন, পোড়া কপাল ! আমি নিতে যাব তাদের
ঠিকানা লিখে ! আমার এমন পোড়া অদৃষ্ট না হবে ত তোমার হাতে
পড়ব কেন ? বাপ-মা আমাকে হাত-পা বেঁধে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে
দিলে না কেন ? বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন । বাপ-মা
যে তাহাকে অপাত্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, আজ তেত্রিশ বৎসরের পর
সেই দুর্ঘটনা আবিষ্কার করিয়া তাহার মনস্তাপের অবধি রহিল না ।
কহিলেন, আজ যদি তুমি ছ'চক্ষু বোজো, আমি না হয় কারো বাড়ি
দাসীবৃত্তি করে থাবো, সে আমাকে করতেই হবে তা বেশ জানি—
আমার মণি-হরি যে কোথায় দাঢ়াবে, তাৰ—বলিয়া সিদ্ধেশ্বরীর
অবরুদ্ধ ক্রন্দন একক্ষণে মুক্তিলাভ করিয়া একেবারে তুই চক্ষু
ভাসাইয়া দিল ।

জরুরী মকদ্দমার দলিল-দস্তাবেজ গিরীশের মগজ হইতে লুপ্ত
হইয়া গেল । স্তৰীর আকস্মিক ও অত্যুগ্র ক্রন্দনে উদ্ব্লাস্ত হইয়া তিনি
ত্রুদ্ধ, গম্ভীরকষ্টে ডাক দিলেন—হৰে ?

হৱি পাশের ঘরে পড়িতেছিল । শশব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল ।

গিরীশ অচণ্ড একটা ধর্মক দিয়া বলিলেন, ফের যদি তুই ঝগড়া
করবি ত ঘোড়ার চাবুক তোর পিঠে ভাঙবো । হারামজাদার লেখা-
পড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, কেবল দিনরাত খেলা আৰ ঝগড়া ! মণি কৈ ?

পিতার কাছে বকুনি থাওয়াটা ছেলেরা জানিতই না। হরি
হত্যুদ্ধি হইয়া কহিল, জানিনে।

জান না ? তোদের বজ্জাতি আমি টের পাইনে, বটে ? আমার
সবদিকে চোখ আছে, তা জানিস ? কে তোদের পড়ায় ? ডাক
তাকে ?

হরি অব্যক্তকষ্টে কহিল, আমাদের থার্ডমাস্টার ধীরেনবাবু
সকালে পড়িয়ে যান।

গিরীশ প্রশ্ন করিলেন, কেন সকালে ? রাত্রে পড়ায় না কেন
শুনি ? আমি চাইনে এমন মাস্টার, কাল থেকে অন্য লোক পড়াবে।
যা, মন দিয়ে পড় গে যা ; হারামজাদা বজ্জাত !

হরি শুক খানমুখে মায়ের মুখের দিকে একবার চাহিয়া ধীরে
ধীরে প্রশ্নান করিল।

গিরীশ স্তুর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, দেখেচ আজকালকার
মাস্টারগুলোর স্বভাব ? কেবল টাকা নেবে, আর ফাঁকি দেবে।
রমেশকে বলে দিয়ো, কালই যেন এই ধীরেনবাবুকে জবাব দিয়ে
অন্য মাস্টার রেখে দেয়। মনে করেচে, আমার চোখে ধূলো দিয়ে
সে এড়িয়ে যাবে।

সিদ্ধেশ্বরী কোন কথা কহিলেন না। স্বামীর মুখের প্রতি শুধু
একটা রোষকষায়িত তীব্রদৃষ্টি নিষ্কেপ করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া
গেলেন এবং গিরীশ কর্তব্যকর্ম সুচারুরূপে সমাপন করিয়াছেন মনে
করিয়া হৃষ্টচিত্তে তৎক্ষণাত তাহার কাগজপত্রে মনোনিবেশ করিলেন।

টাকা জিনিসটা সংসারে যে আবশ্যকীয় বস্তু, এ খবর সিদ্ধেশ্বরীর
যে জানা ছিল না, তাহা নয়, কিন্তু সেদিকে এতদিন তাহার খেয়াল
ছিল না। কিন্তু লোভ একটা সংক্রামক ব্যাধি। নয়নতারার
হৌয়াচ লাগিয়া সিদ্ধেশ্বরীরও দেহ-মনে এই ব্যাধি ধীরে ধীরে
পরিব্যাপ্ত হইতে ছিল।

আজই থাওয়ার পর শৈল এ বাটি হইতে বিদ্যায় লইবে,
এইরূপ একটা জনশ্রুতিতে সিদ্ধেশ্বরীর বুক ফাটিয়াং একটা সুদীর্ঘ ক্রমন-

বাহির হইবার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছিল। তিনি সেইটা কোনমতে নিবারণ করিয়া অরের ভাষ করিয়া বিছানাতেই পড়িয়া ছিলেন, নয়নতারা আসিয়া নিকটে বসিল। গায়ে হাত দিয়া অরের উভাপ অনুভব করিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিল এবং ডাক্তার ডাকা উচিত কিনা জিজ্ঞাসা করিল।

সিঙ্কেশ্বরী অগ্নিকে মুখ ফিরাইয়া সংক্ষেপে বলিলেন, না।

নয়নতারা বিরক্তির কারণ অনুভব করিয়া ঠিক ওষুধ দিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, তাই আমি ভাবছিলুম দিদি, লোক কি করে হাতে এত টাকা করে। আমাদের পাড়ায় যত্নবাবু, গোপালবাবু, হারাণ সরকার কেউ ত আমার বট্টাকুরের অর্ধেক রোজগার করে না, তবু তাদের কারও লাখ টাকার কম ব্যাকে জমা নেই। তাদের পরিবারদের হাতেও দশ-বিশ হাজারের কম নেই।

সিঙ্কেশ্বরী সঁইৎ আকৃষ্ট হইয়া কহিলেন, কি করে জানলে মেজবৌ।

নয়নতারা কহিল, উনি যে ব্যাকের সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তারা সব এর বক্তু কিনা। কাল গোপালবাবুর স্ত্রী আমার কথায় অবিশ্বাস করে বললে, এ কি একটা কথা মৌজবৌ, যে তোমার দিদির হাতে টাকা নেই? যেমন করে হোক—

সিঙ্কেশ্বরী জ্বর ভুলিয়া উঠিয়া বসিয়া নয়নতারার সম্মুখে চাবির গোছাটা ঝনাঁ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, বাক্স-পেটরা তুমি নিজের হাতে খুলে দেখ না মেজবৌ, সংসার খরচের টাকা ছাড়া কোথাও যদি লুকোন একটা পয়সা দেখিতে পাও। যা করবে ছোটবৌ। আমার কি একটা কথা বলবার জো ছিল! এমন সোয়ামীর হাতেপড়েছিলুম মেজবৌ, যে কখনও একটা পয়সার মুখ দেখতে পেলুম না। তেমনি শাস্তি ও হয়েচে। এখন সে সর্বস্ব নিয়ে চলে যাচ্ছে— কি করবে তার? কিন্তু আমার হাতে টাকা থাকলে সে টাকা ঘরেই থাকত, না এমনি করে জলে যেত তা বল দেখি মেজবৌ?

মেজবৌ মাথা নাড়িয়া কহিল, সে ত সত্যি কথা দিদি।

সিঙ্কেশ্বরীর মন শৈলর বিরঞ্জে আবার শক্ত হইয়া উঠিল। এতদিন

যে তিনি নিজেই শৈলকে মানুষ করিয়া নিজের সিন্দুকের চাবি তাহার হাতে দিয়া, আপনি ছোট হইয়া সংসারের মধ্যে তাহাকে বড় করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন সে কথাটা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। বলিলেন, একটা লোক রোজগারী, আর এতবড় সংসার তাঁর মাথায়, তাঁরই বা মোষ দিই কি করে বল দেখি ?

· নয়নতারা সায় দিয়া বলিল, সে ত সবাই দেখতে পাচ্ছি দিদি !

একটু চুপ করিয়া নয়নতারা ঘৃঙ্খলিতে লাগিল, আমাদের গায়ের নল মিঞ্চির একজন ডাকসাইটে কেরানী। ছোটভাইকে মানুষ করতে, লেখাপড়া শেখাতে তার ছেলেমেয়েদের বিষ্ণে দিতে নিজের হাতে আর কানাকড়িটি রাখলে না। বড়বো বলতে গেলে ধরকে জবাব দিত—

সিদ্ধেশ্বরী কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিলেন, ঠিক আমার দশা আর কি !

নয়নতারা কহিল, তা বৈ কি। বড়বোকে নল মিঞ্চির ধরকে বলত, তোমার ভাবনা কি ? তোমার নরেন রইল। তাকে যেমন মানুষ করে উকীল করে দিলুম বুড়ো বয়সে সেও আমাদের তেমনি দেখবে ! মনে ভেবো, সে তোমার দেওর নয়, সন্তান। কিন্তু এমনি কলিকাল দিদি, সে নল মিঞ্চিরের চোখে ছানি পড়ে যখন চাকরিটি গেল তখন নরেন উকীল—সহোদর ভাই হয়ে দাদাকে টাকা ধার দিয়ে স্বদে আসলে পৈতৃক বাড়িটার অংশ পর্যন্ত নৌলামডেকে নিলে। এখন নল মিঞ্চির ভিক্ষে করে খায়, আর কেঁদে বলে, স্তুর কথা না শুনেই এখন এই অবস্থা। তবু ত খুড়তুত-জাঠতুত নয়, মায়ের পেটের ভাই।

সিদ্ধেশ্বরী মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন, বল কি মেজবো ।

নয়নতারা বলিল, মিছে নয় দিদি, এ কথা দেশগুৰু লোক জানে।

সিদ্ধেশ্বরী আর কথা কহিলেন না। তৎপূর্বে তাহার এক-একবার মনে হইতেছিল, শৈলকে ডাকিয়া নিষেধ করেন ; এবং কি করিলে যে তাহাদের যাওয়ার বিষ্ণ ঘটিতে পারে, মনে মনে ইহাও নানাক্রপ আলোচনা করিতেছিলেন ; কিন্তু নল মিঞ্চিরের দ্রবস্থার ইতিহাসে

ତୋହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଏକେବାରେ ବିଫଳ ହଇଯା ଗେଲ । ଶୈଳକେ ବାଧା ଦିବାର ଆର ତୋହାର ଚେଷ୍ଟାମାତ୍ର ରହିଲନା ।

ଗିରୀଶ ତଥନ ଆଦାଲତେର ଜନ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁତେ ଉଠି-ଉଠି କରିତେ ଛିଲେନ ; ରମେଶ ଆସିଯା କହିଲ, ଆମି ଦେଶେର ବାଡ଼ିତେ ଗିଯେଇ ଥାକବ ମନେ କରଚି ।

କେନ ?

ରମେଶ କହିଲ, କେଉ ବାସ ନା କରଲେ ବାଡ଼ି-ଘର-ଦୋର ଭେଙ୍ଗେଚୁରେ ଯାଏ, ଆର ଜମି-ଜାଯଗା ପୁକୁରଗୁଲୋଓ ଖାରାଂପ ହେଁ ଯାଏ । ଆମାରଓ ଏଥାନେ କୋନ କାଜ ନେଇ । ତାଇ ବଲଚି ।

ବେଶ କଥା ! ବେଶ କଥା ! ବଲିଯା ଗିରୀଶ ଖୁଶି ହଇଯା ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଲେନ ।

ଛୋଟଭାଇସେର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଭିତରେ ସେ କତ ଗୁହ୍ୟବିଚ୍ଛେଦ, କତଥାନି ଘନୋମାଲିନ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ଛର ଛିଲ ମେ-ସଂବାଦ ଭଦ୍ରଲୋକ କିଛୁଇ ଜାନିତେନ ନା । ତିନି ଆଦାଲତେ ବାହିର ହଇଯା ଯାଇବାର ପରେଇ ଶୈଳ ବଡ଼ଜାୟେର ସରେର ଚୌକାଠେର ନିକଟ ହିଁତେ ତୋହାକେ ଗଡ଼ ହଇଯା ପ୍ରଣାମ କରିଲ ଏବଂ ସାମାଜ୍ୟ ଏକଟି ତୋରଙ୍ଗମାତ୍ର ମଙ୍ଗେ ଲାଇଯା ଦୁଇ ଛେଲେର ହାତ ଧରିଯା ବାଡ଼ି ହିଁତେ ବାହିର ହଇଯା ଗେଲ ।

ମିଦ୍ଦେଶ୍ଵରୀ ବିଛାନାର ଓପର କାଠ ହଇଯା ପଡ଼ିଯା ରହିଲେନ ଏବଂ ନଯନତାରୀ ନିଜେର ଦୋତଲାର ସରେର ଜାନାଲା ଖୁଲିଯା ଦେଖିତେଲାଗିଲ ।

ଆଟ

ଗୋଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାଣ ଥାଟ ଜୋଡ଼ା କରିଯା ମିଦ୍ଦେଶ୍ଵରୀର ବିଛାନା ଛିଲ । ଏତ ବଡ଼ ଶୟାତେଓ କିନ୍ତୁ ତୋହାକେ ସ୍ଥାନାଭାବେ ସଙ୍କୁଚିତ ହଇଯା ସାରାରାତ୍ରି କଟେ କାଟାଇତେ ହିଁତ । ଏ ଲାଇଯା ତିନି ରାଗାରାଗି କରିତେଓ ଛାଡ଼ିତେନ ନା, ଆବାର ବାଡ଼ିର କୋନ ଛେଲେକେ ଏକଟା ରାତ୍ରିଓ ତିନି କାଢିଛାଡ଼ା କରିତେ ପାରିତେନ ନା । ସମସ୍ତ ରାତ୍ରି ତୋହାକେ ସତର୍କ ହଇଯା ଥାକିତେ ହିଁତ, ଅନେକବାର ଉଠିତେ ହିଁତ; କୋନଦିନଇ ସୁନ୍ଦର ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ମନେ ସୁମାଇତେ ପାରିତେନ ନା ; ଅର୍ଥଚ ଶୈଳ କିଂବା ଆର କେହ ସେ ଏଇସକଳ ଉତ୍ପାତ ହିଁତେ ତୋହାକେ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏ ଅଧିକାରଙ୍ଗ କାହାକେଓ ଦିତେନ ନା । ତୋହାର ଏତବଡ଼ ଅସୁଧେର ସମୟରେ ଜ୍ୟାଠୀଇମାର ବିଛାନା ଛାଡ଼ା କୋନ

ছেলেরই কোথাও ঘুমাইবার স্থান ছিলনা। কানাইয়ের শোয়া ধারাপ তাহার জন্য এতটা স্থান চাই, ক্ষুদে প্রায়ই একটা অপরাধ করিয়া ফেলিত, তাহার জন্য অয়েলক্সথের ব্যবস্থা ; বিপিন চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিত, তাহার আর একপ্রকার বন্দোবস্ত ; পটলের আড়াই প্রহরের সময় ক্ষুধাবোধ হইত, শিয়রের কাছে সে আয়োজন রাখিতে হইত ; খেদির বুকের উপর কানাই পা তুলিয়া দিয়াছে কিনা, পটলের নাকটা বিপিনের হাঁটুর তলায় চাপা পড়িয়াছে কিনা, এই সব দেখিতে দেখিতে আর বকিতে বকিতেই সিঙ্কেশ্বরীর রাত্রি পোহাইত ।

আজ শোবার সময় বিছানায় এতখানি জায়গা যে ধালি পড়িয়া ধাকিবে, শৈলের যাবার সময় সিঙ্কেশ্বরীর সে হঁশ ছিলনা। নয়নতারা শতকোটি মাথার দিব্য দিবার পর তিনি রাত্রে নৌচে হইতে থাইয়া ঘরে আসিতেছিলেন, হঠাৎ শৈলের ঘরের দিকে চোখ পড়ায় কেয়েন তাহার বুকে মুণ্ডুর দিয়া মারিল। ঘরে আলো নাই, দর্জা ছইটা খোলা—সিঙ্কেশ্বরী মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে আসিয়া অবেশ করিলেন। শয়ার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, অল্প একটুখানি স্থানের মধ্যে বিপিন এবং ক্ষুদে ঘুমাইতেছে—বাকী বিছানাটা তপ্ত মরুর মত শূঝ খাঁখী করিতেছে। নিজের অপরিসর স্থানটুকুতে তিনি নীরবে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন ; কিন্তু সেই ছুটি নিমৌলিত চোখের কোণ বাহিয়া তখন অজস্র তপ্ত অশ্রুতে তাহার মাথার বালিশ ভিজিয়া যাইতে লাগিল। বাটীর ছেলেদের ধাওয়া ধাওয়া সম্বন্ধে তিনি চিরদিনই অত্যন্ত খুঁতখুঁতে। এ বিষয়ে আপনাকে ছাড়া তিনি আর কাহাকেও একবিন্দু বিশ্বাস করিতেন না। তাহার বদ্ধ সংস্কার ছিল, নিজে উপস্থিত না ধাকিলেই ছেলেরা নানাপ্রকারে ফাঁকি দিয়া কম খায় এবং এ ফাঁকি তিনি ছাড়া আর কাহারও সাধ্য নাই যে ধরে। দৈবাত্ম কোনগতিকে কোন ছেলের ধাওয়া চোখে দেখিতেন না পাইলে তাহাকে জেরাকরিয়া, তাহার পেটে হাত দিয়া অন্তর্ভুক্ত করিয়া, নানারকমে সিঙ্কেশ্বরী প্রতিপন্থ করিবার চেষ্টা করিতেন—সে কিছুতেই তাহার শ্বায় আহার করে নাই, এবং এই অন্যায়টুকু সংশোধন করিতে হতভাগ্য ছেলেটাকে

তথনই তাহার চোখের উপর দাঢ়াইয়া একবাটি দুধ খাইতে হইত। শৈল ছেলেদের হইয়া মাঝে মাঝে লড়াই করিত; জবরদস্তি খাওয়ানোর অপকারিতা লইয়া তর্ক করিত; কিন্তু সিদ্ধেশ্বরীকে আন্তরিক ত্রুটি করিয়া তোলা ভিন্ন তাহাতে আর কোন ফল হইত না। সিদ্ধেশ্বরী যখনই যে ছেলেটার পানে চাহিতেন, তথনই দেখিতেন সে রোগ। হইয়া যাইতেছে। এই লটিয়া তাহার উৎকর্ষা, অশাস্ত্রির অবধি ছিল না।

আজ বিছানায় শুইয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, দেশের বাটীর বহুবিধ বিশৃঙ্খলার মধ্যে হয়ত কানাইয়ের খাইয়াপেট ভরে নাই এবং পটল নিশ্চয়ই না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, হয়ত তাহাকে তুলিয়া খাওয়ানো হইবে না, হয়ত সে সারারাত্রি ক্ষুধায় ছটফট করিবে—কল্পনায় যতই এই সকল দুর্ঘটনা তিনি স্পষ্টদেখিতে লাগিলেন, ততই রাগে দুঃখে বেদনায় তাহার বুক ফাটিতে লাগিল। পাশের ঘরে গিরীশ অকাতরে ঘুমাইতেছিলেন। আর সহু করিতে না পারিয়া তিনি অনেক বাত্রে শামীর শয্যাপার্শে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গায়ে হাত দিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, মানলুম যেন, পটলকে শৈল নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু কানাই ত আর তার পেটের ছেলে নয়,—তার ওপর তার জোর কি?

গিরীশ ঘুমের ঝোকে জবাব দিলেন, কিছু না।

সিদ্ধেশ্বরী আশাহীত হইয়া শয্যাংশে বসিয়া বলিলেন, তা হলে আমরা নালিশ করে দিলে যে তার শাস্তি হয়ে যেতে পারে। পারে কিনা ঠিক বলো ?

গিরীশ অসংশয়ে বলিলেন, নিশ্চয় শাস্তি হবে।

সিদ্ধেশ্বরী আশার আনন্দে উভেজিত হইয়া উঠিলেন। পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, সে যেন হ'লো ; কিন্তু ধরো পটল। তাকে ত আমিই মানুষ করেচি। হাকিমকে যদি বুঝিয়ে বলা যায়, সে আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না, চাই কি ভেবে তার শক্ত অসুখ হতে পারে,—তাহলে হাকিম কি রায় দেবে না যে সে তার জ্যাঠাইমার কাছে থাকুক? বেশ ! অমনি তোমার নাক ডাকচে—আমার কথা বুঝি তবে শোননি!

বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী স্বামীর পায়ের উপরে সজোরে নাড়া দিলেন।

গিরীশ জাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, নিশ্চয় না।

সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া বলিলেন, কেন নয়? মা বলেই যে ছেলেকে মেরে ফেলবে মহারানীর এমন কিছু হৃকুম নেই। কালই যদি মেজঠাকুরপোকে দিয়ে উকীলের চিঠি দিই, কি হয় তা হলে? —বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী উত্তরের আশায় ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া অত্যুত্তরে স্বামীর নাসিকাধৰনি শুনিয়া রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

সারারাত্রি তাহার লেশমাত্র ঘূম আসিল না। কখন সকাল হইবে, কখন হরিশকে দিয়া উকীলের চিঠি পাঠাইয়া ছেলের দাবী করিবেন, চিঠি পাইয়া তাহারা কিরণ ভীত ও অনুত্পন্ন হইয়া কানাই ও পটলকে রাখিয়া যাইবে, এই সমস্ত আশা ও আকাশকুম্ভের কল্পনা তাহাকে সমস্ত রাত্রি সজাগ করিয়া রাখিল।

অভাত হইতে না হইতে তিনি হরিশের দ্বারে আসিয়া আঘাত করিয়া বলিলেন, মেজঠাকুরপো, উঠেচ?

হরিশ ব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া আশৰ্চর্য হইয়া গেলেন।

সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন, দেরি করলে চলবে না, এখনো ছোটঠাকুর-পোদের নামে উকীলের চিঠি লিখে, দরোয়ান পাঠাতে হবে। তুমি বেশ করে একখানা চিঠি লিখে বলে দাও যে, চরিশ ঘটার মধ্যে জ্বাব না পেলে নালিশ করা হবে।

হরিশকে এ বিষয় উদ্দেজিত করা বাহুল্য। তিনি তৎক্ষণাতঃ রাজী হইয়া, গলা খাটো করিয়া প্রশ্ন করিলেন, ব্যাপারটা কি বল দেখি বড়বো? বসো, বসো—কি কি নিয়ে গেছে? দাবীটা একটু বেশী করে দেওয়া চাই। বুঝলে না?

সিদ্ধেশ্বরী খাটের উপর আসন গ্রহণ করিয়া : দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া, তাহার দাবীটা বিবৃত করিলেন।

বিবরণ শুনিয়া হরিশের হর্ষেজ্জল মুখ কালি হইয়া গেল। কহিলেন, তুমি কি ক্ষেপেচ বড়বোঠান? আমি বলি, বুঝি আর-কিছু। তাদের ছেলে তারা নিয়ে গেছে, তুমি করবে কি?

সিদ্ধেশ্বরী বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, তোমার দাদা যে
বললেন, নালিশ করলে তাদের সাজা হয়ে যাবে!

হরিশ কহিলেন, দাদা এমন কথা বলতেই পারেন না। তোমাকে
তামাশা করেচেন।

সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া কহিলেন, একটা বয়স হ'লো তামাশা
কাকে বলে বুঝিনে ঠাকুরপো? তোমার মনোগত ইচ্ছে নয় যে,
ছেলে-ছুটাকে কাছে আনি। তাই কেন স্পষ্ট করে বল না?

হরিশ লজ্জিত হইয়া তখন বহুপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন
যে, এ দাবী আদালত গ্রাহ করিবে না। তার চেয়ে বরং আর কোন
দাবীদাওয়া উত্থাপন করিয়া জরু করা যাইতে পারে। আমাদের
উচিত এখন তাই করা।

সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধভরে উঠিয়া দাঢ়াইলেন, কহিলেন, তোমার
উচিত তোমার থাক ঠাকুরপো; আমার তিনকাল গিয়ে এককাল
ঠেকেছে, এখন মিথ্যে দাবী-দাওয়া করতে পারবো না। পরকালে
আমার হয়ে ত আর তুমি জবাব দিতে যাবে না! তুমি না লেখো,
আমি মণিকে পাঠিয়ে নগেনবাবুর কাছ থেকে লিখিয়ে আনি গে।
বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

পরদিন সকালবেলায় কি একটা কাজে বাজার-খরচের হিসাব লইয়া
সিদ্ধেশ্বরী বাড়ির সরকার গণেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে বচসা করিতেছিলেন।
সে বেচারা নানাপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল যে, বারো গণ্ডা
টাকার উপর আরও ছ'টাকা খরচ হওয়াতেই পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হইয়া
গিয়াছে। গৃহিণী এ কর্মে নৃতন ব্রতী। তাহার নৃতন ধারণা—তাহাকে
নির্বোধ পাইয়া সবাই টাকা চুরি করে। অতএব চক্রবর্তীও যে চুরি
করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি তর্ক করিতেছিলেন, পঞ্চাশ
টাকা যে এক আঁজলা টাকা গণেশ। আমি লেখাপড়া জানিনে বলেই
কি তুমি বুঝিয়ে দেবে যে, বারো গণ্ডার ওপর মোটে ছুটি টাকা বেশী
খরচ হয়েচে বলে এই পঞ্চাশ-পঞ্চাশটে টাকা সব খরচ হয়ে গেছে—
আর কিছু নেই? আমি কি এতই বোকা!

গণেশ ব্যাকুল হইয়া বলিল, মা, দিদিকে ডেকে না হয়—

নৌলাকে ডেকে হিসেব বুঝতে হবে ? সে আমার চেয়ে বেশী বুঝবে ? না গণেশ, ওসব ভাল কথা নয়। শৈল নেই বলেই যে তোমার যা ইচ্ছে তাই করে হিসেব দেবে সে হবে না বলচি। না সে যাবে, না আমাকে এত ঝঞ্চাট পোয়াতে হবে। পোড়ারমূঘীকে দশ-বছরের মেয়ে বৈ করে আনলুম, বুকে করে মানুষ করে এতবড় করলুম, এখন সে তেজ করে বাড়ির দু-দুটো ছেলে নিয়ে পালিয়ে গেল। তা যাক। আমিও খবর রাখচি। কানাই-পটলের কোনদিন এতটুকু অনুর শুনতে পেলে দেখব, কেমন করে সে ছেলে রাখে ! তা এখন যাও— তৃপুরবেলা মনে করে বলে যেয়ো, এতগুলো টাকা কোথায় কি করলো। —বলিয়া গণেশকে বিদায় দিলেন।

সে বেচোরা হতবুদ্ধি হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মেজবৌ আসিয়া কহিল, দিদি, বলতে পারিনে, কিন্ত আমিও সংসার চালিয়েচি, টাকাকড়ি হিসাবপত্র সব রেখেচি। ছোটবৌ নেই বলে যে এত ঝঞ্চাট তুমি সহ করবে, আর আমি বসে বসে দেখব, সে ভাল নয়। আমার কাছে কারো চালাকি করে হিসেবে গোল করবার জো নেই।

সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন, সে ত ভাল কথা মেজবৌ। আমার এই রোগা শ্রীরে এত হাঙ্গামা কি ভাল লাগে ! শৈল ছিল—যেখানকার যত টাকা তার হিসেব করা, ধরচ করা, ব্যাকে পাঠানো—সমস্তই তার কাজ। এসব কি আর আমাকে দিয়ে হয় ? বেশ ত, এখন থেকে তুমিই করো মেজবৌ।—বলিয়া সিন্দুকের চাবিটা কিন্ত নিজের আঁচলেই বাঁধিয়া ফেলিলেন।

দিন কাটিতে লাগিল। নয়নতারা সহস্র কৌশল উন্নাবন করিয়াও লোহার সিন্দুকের চাবিটা আর নিজের আঁচলে বাঁধিতে সমর্থ হইল না। নয়নতারা অত্যন্ত কৌশলী এবং চতুর, অনেকখানি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিতে পারিত। কিন্ত এই একটা তাহার বড় রকমের গোড়ায় গলদ হইয়া গিয়াছিল যে, স্বার্থের জন্য নিরীহ লোকের মনে সংশয়ের

বৌজ বপন করিলে যথাকালে তাহার ফলভোগ হইতে নিজেকেও দূরে
রাখা যায় না। সে শক্রপক্ষকে যেমন সন্দেহ করিতে শিথে, মিত্র
পক্ষেরও উপরও তেমনি বিশ্বাস হারায়, স্মৃতরাং সিদ্ধেশ্বরী যে-মুহূর্তে
ছোট-বৌয়ের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছেন, মেজবৌকেও ঠিক সেই
মুহূর্তেই অবিশ্বাস করিতে শিখিয়াছেন।

নয়

কোন একটা অভাব লইয়া—তা সে যতই গুরুতর হউক, মাঝুষ
অনন্তকাল শোক করিতে পারে না। সিদ্ধেশ্বরীর কাছে তাহার শয়ার
শূণ্যতা ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। শৈলরঘরের দিকটা তিনি
মাড়াইতেই পারিতেননা, এখন সে বারান্দা স্বচ্ছদেপার হইয়া যান—
মনেও পড়ে না। কানাই-পটলের সংবাদ তিনি বিবিধ উপায়ে সংগ্ৰহ
করিবার জন্য অহৰহ উৎকৃষ্টিত থাকিতেন, এখন সে উৎকৃষ্টার অর্ধেক
তিরোহিত হইয়া গেছে। এইরূপে শুধু-তুঃখে একবৎসর ঘূরিয়া গেল।

সেদিন হঠাৎ সিদ্ধেশ্বরীর কানে গেলযে, দেশের বিষয় লইয়া আজ
ছয় মাস ধরিয়া ছোট-দেবরের সহিত তাহাদের মামলা চলিতেছে।
মকদ্দমা চালাইতেছে হরিশ নিজে। দেওয়ানী ত চলিতেছেই, গোটা-
হই ফৌজদারীও ইতিমধ্যে হইয়া গেছে। খবর শুনিয়া সিদ্ধেশ্বরী ভয়ে
ভাবনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন।

স্বামীর নিকট হইতে সম্পূর্ণ কৌতুহল নিয়ন্তি করিবার মত সংবাদ
জানার শুবিধা হইবে না জানিয়া তিনি সক্ষ্যার সময় হরিশের কাছে
গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, বল কি ঠাকুরপো, ছোটঠাকুরপো
করচে তোমার দাদাৰ সঙ্গে মামলা ?

হরিশ উচ্চ অঙ্গের একটুখানি হাস্ত করিয়া কহিলেন, তাই ত হচ্ছে
বৈষ্ঠন।

সিদ্ধেশ্বরী মুখ পাংশুবর্ণ করিয়া বলিলেন, আমাৰ যে বিশ্বাস হয়
না, মেজঠাকুরপো। এখনো যে চল-সূর্য উঠচে।

নয়নতারা খাটের একধারে বসিয়া খেঁদিকে ঘূম পাড়াইতেছিল,

মৃছস্বারে কহিল, সে ত উঠচেই দিদি। আর এই ছোট-দেওরকেই তোমরা হাজার হাজার টাকা ব্যবসা করতে দিতে। সে সব ত তখন যায়নি, যাচ্ছে এখন।

সিদ্ধেশ্বরী ছাঃসহ বিশ্বয়ে কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মকদ্দমা কেন?

হরিশ বলিলেন, কেন! দেখলুম, মকদ্দমা না করে আর উপায় নেই। দেশের বিষয়ই বিষয়। দেখলুম আমরা গেলে আমাদের মণি-হরি বিপিন-কুন্দে এক কাঠা জমি-জায়গা ত পাবেই না—দেশের বাড়িতে হয়ত চুকতে পর্যন্ত পাবে না। ধর না বড়বো, দেশে যা কিছু আছে, সে-ই সমস্ত দখল করে বসে গেছে। খাজনাপত্র আদায় করছে, খাচ্ছে দাচ্ছে—একটা পয়সা পর্যন্ত দেবার নাম করে না। বিষয় যা কিছু তা ত দাদাই করেছেন, অথচ দাদার চিঠির একটা জবাব পর্যন্ত দিলে না—এমনি নেমকহারাম রমেশ। আমিও বাড়ি থেকে তাকে বার করে দিয়ে তবে ছাড়ব এই আমার প্রতিজ্ঞ।

সিদ্ধেশ্বরী আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তারাই বা ছেলেপিলে নিয়ে যাবে কোথায়?

হরিশ বলিলেন, সে খবরে আমাদের ত দরকার নেই, বড়বো।

সিদ্ধেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার দাদা কি বললেন?

হরিশ বলিলেন, দাদা যদি তেমন হতেন, তা হলে ত ভাবন। ছিল না বড়বো। যখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম, রমেশ তাঁর খেয়ে-পরে, তাঁর টাকায় তাঁরই বিষয় নিয়ে গোলযোগ বাধিয়েছে, তখনই তিনি মত দিলেন। ফৌজদারীতে রমেশ ত দাদাকেই জড়িয়ে তোলার চেষ্টায় ছিল। অনেক কষ্টে আমাকে সেটা কাসাতে হয়েচে।

নয়নতারা ফিসফিস করিয়া বলিল, আচ্ছা, ছোটঠাকুরপোই যেন দোষী, কিন্তু, আমি কেবল ভাবি দিদি, ছোটবো কি করে এতে মত দিলে, আমরা আর সবাই দৃষ্ট বজ্জাত হতে পারি, কিন্তু সে তাঁর বঢ়ঠাকুরকে ত চেনে। তাকে জেলে দিয়ে সে কি স্বৰ্থ পেত?

সিদ্ধেশ্বরীর আপাদমস্তক বারংবার শিহরিয়া উঠিল। তিনি আর

একটি কথাও না বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

তখ্ন হইতে আসিয়া সিদ্ধেশ্বরী স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। গিরীশ যথারূপি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মুখ তুলিয়া স্তুর মুখের প্রতি চাহিতেই তাহার অস্বাভাবিক পাঞ্চুরতা আজ তাহারও চোখে পড়িল। হাতের কাগজখানা রাখিয়া দিয়া বলিলেন, আর্জ কখন জ্বর এল?

সিদ্ধেশ্বরী অভিমানভরে বলিলেন, তবু ভালো, জিজ্ঞাসা করলে।

গিরীশ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, বিলঙ্ঘণ। জিজ্ঞেসা করিনি ত কি? পরশ্বে ত মণিকে ডেকে বললুম, তোর মাকে শৃষ্ট-টৃষ্ণ দিস? তা আজকালকার ছেলেগুলো হয়েচে সব এমনি যে, বাপ-মাকে পর্যন্ত মানে না।

সিদ্ধেশ্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, বুড়োবয়সে মিথ্যে কথাগুলো আর ব'লো না, পনের দিন হয়ে গেল, মণি তার পিসির শোখানে এলাহাবাদে গেছে, আর তুমি তাকে পরশ্ব জিজ্ঞাসা করলে! কখনো যা করনি, তা কি আজ করবে? তা নয়, আমি সেজন্যে আসিনি। আমি এসে জানতে, ব্যাপারটাকি? ছোটঠাকুরপোর সঙ্গে মামলা-মকদ্দমা কিসের?

গিরীশ মহা গান্ধা হইয়া উঠিলেন, মেটা একটা চোর! চোর! একেবারে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে! বিষয়পত্র সব নষ্ট করে ফেললে। মেটাকে দূর করে না দিলে দেখচি আর ভদ্রস্ত নেই—সমস্ত ছারথার, ধৰ্মস করে দিলে।

সিদ্ধেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা তা যেন দিলে, কিন্তু মামলা-মকদ্দমা ত শুধু শুধু হয় না, টাকা খরচ করা ত চাই? ছোটঠাকুরপো টাকা পাচ্ছে কোথায়?

ইতিমধ্যে হরিশ নামিয়া আসিয়া ছেলেদের পড়িবার ঘরে যাইতেছিলেন, দাদার উচ্চকর্ণে আকৃষ্ট হইয়া ধৌরে ধৌরে ঘরে ঢুকিলেন। তিনি জবাব দিলেন—টাকার কথা ত এইমাত্র মেজবো বলে দিলেন বড়বোঠান! পাটের দালালির নাম করে দাদার কাছ থেকে হাজার চারেক নিয়েছিল, মেটা ত হাতে আছেও; তা ছাড়া ছোটবোমার হাতেই ত এতদিন টাকাকড়ি সমস্ত ছিল—বুঝেই দেখ না!

গিরিশ পুনরায় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—আমার সর্বস্ব নিয়ে
গেছে, কিছু আর রেখেচে হে হরিশ ! সেটা একেবারে বেহেড় লক্ষ্মী-
ছাড়া হয়ে গেছে ! শুক্রবার দিন কোটে এসে বলে—বাড়ি-ঘরদোর
মেরামত করতে হবে, পাঁচশ টাকা চাই ।

হরিশ অবাক হইয়া গেলেন, বলেন কি ? সাহস ত কম নয় !

গিরিশ কহিলেন, সাহস বলে সাহস ! একেবারে লম্বা ফর্দ—
এখানটা সারাতে হবে, ওখানটা গাঁথাতে হবে ; এটা না বদলালে নয়,
ওটা না করলেই চলে না । শুধু কি তাই ! সংসারের অনটন—শীতের
কাপড় চোপড় কিনতে হবে—ধান কিনে, আলু কিনে রাখতে হবে,—
এমনি হাজারো খরচ দেখিয়ে আরও তিনশ টাকার দরকার ।

হরিশ অসহ ক্রোধ কোনমতে সংবরণ করিয়া শুধু কহিলেন,
নিলঞ্জ ! তারপরে ?

গিরিশ বলিলেন, ঠিক তাই । হতভাগার একেবারে লজ্জাশরম
নেই—একেবারে নেই । এই আটশ' টাকা নিয়ে তবে ছাড়লে ।

নিয়ে গেল ? আপনি দিলেন ?

গিরিশ বলিলেন, না হলে কি ছাড়ে ? নিয়ে তবে উঠল যে ।

হরিশের সমস্ত মুখ্যানা প্রথমটা অগ্নিবর্ণ হইয়া পরক্ষণেই ছাইয়ের
মত হইয়া গেল ! শুরু হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিলেন, তা
হলে মামলা-মকদ্দমা করে আর লাভ কি দাদা ?

গিরৌশ তৎক্ষণাত বলিলেন, কিছু না, কিছু না । নিজের সংসারটা
যে চালিয়ে নেবে হতভাগার সেটুকু ক্ষমতাও নেই—এমনি অপদার্থ
হয়ে গেছে । শুনি, বৈঠকখানায় দিবিয় আড়া বসিয়ে নিনরাত তাস
পাশা চলচে, আর খাচেন—ব্যস । মাঝুষ যেমন শিব-স্থাপনা করে,
আমাদেরও হয়েচে তাই—বুঝলে না হরিশ ! বলিয়া নিজের রসিকতায়
নিজেই মাতিয়া উঠিয়া হোহো রবে হাসিয়া ঘর ভরিয়া দিলেন ।

হরিশ আর সহ করিতে না পারিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন ।
দ্বাতে দ্বাত চাপিয়া বলিতে লাগিলেন, আচ্ছা, আমি একাই দেখচি ।

মাঘ মাসের বাইশে মকদ্দমার দিন ছিল । বিশে গিরিশের এক
জ্ঞাতিকস্থার বিবাহে কন্যার পিতা আসিয়া গিরিশকে চাপিয়া ধরিলেন,

দাদা, তুমি উপস্থিত থেকে আমার মেয়ের বিবাহ দাও, এই আমার
বড় সাধ। তোমাকে একটি দিনের জন্মেও অন্তত দেশে যেতে হবে।

‘না’ শব্দটা গিরীশের মুখ দিয়া বাহির হইবার জো ছিল না।
তিনি তৎক্ষণাত্মে রাজী হইয়া বলিলেন, যাব বৈ কি ভায়া, নিশ্চয় যাব।

কথার পিতা নিশ্চিন্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এই ‘নিশ্চয়’
কথাটার বাস্তবিক অর্থ যথাকালে যে কি হইবে, তাহা সবচেয়ে বেশী
জানিতেন সিদ্ধেশ্বরী। মৃতরাং প্রতিশ্রুতির বিবরণ যদিচ স্বামী বিস্মৃত
হইয়াছিলেন, ত্রু হন নাই।

বিশে সকালে গিরীশ আকাশ হইতে পড়িয়া কহিলেন, বল কি !
আজ যে আমার সেই জয়পুরের মক—

না, সে হবে না। তোমাকে যেতেই হবে। উকীল হয়ে পর্যন্ত
ত মিছে কথা বলে আসচ—আজ একটা কথাও রাখো। পরকালের
ভয় কি তোমার এতটুকু হয় না ?

গিরীশ কৃষ্ণিত হইয়া কহিলেন, পরকাল ? তা বটে—কিন্তু—

না, কিছুতে হবে না, তোমাকে যেতেই হবে। যাও।

অতএব গিরীশকে দেশে যাইতে হইল।

যাইবার সময় সিদ্ধেশ্বরী অত্যন্ত মৃচ্ছকণ্ঠে বলিলেন, ছেলে ছুটোকে
—বলিয়াই হঠাতে কানিয়া ফেলিলেন।

আচ্ছা, আচ্ছা সে হবে, বলিয়া গিরীশ বাহির হইয়া পড়িলেন।
কিন্তু কি হবে, তাহা স্বামী স্ত্রীর কেহই বুঝিলেন না। নয়নতারা গা
টিপিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে অন্তরালে ডাকিয়া কহিল, ও বাড়িতে কিছু
থেতেটেতে বট্টাকুরকে মানা করে দিলে না কেন ?

সিদ্ধেশ্বরী আশ্চর্য হইয়া জিজাসা করিলেন, কেন ?

নয়নতারা মুখখানা বিকৃত-গম্ভীর করিয়া বলিল, বলা যায় কি দিদি।

সিদ্ধেশ্বরীর চোখ দিয়া তখনও জল পড়িতেছিল। অঁচলে মুছিয়া
ফেলিয়া একটুখানি চুপ করিয়া বলিলেন, সে তুমি পার মেজবো।
শ্বেলর গলা কেটে ফেললেও সে তা পারবে না। বলিয়া দ্রুতপদে
চলিয়া গেলেন।

ମକନ୍ଦମାର ତଦବିର କରିତେ ହୁଇ-ଏକଦିନ ପୂର୍ବେ ଜେଲାୟ ସାଇବାର ଜୟ
ରମେଶ ସବେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହିତେଛିଲ । ଶୈଳ ସେଥାନେ ଛିଲ ନା । ସେ
ଠାକୁରଘରେ ମଧ୍ୟେ ଦେହ ହିତେ ତାହାର ସର୍ବଶେଷ ଅଳଙ୍କାରଖାନି ଖୁଲିଯା
ଫେଲିଯା ଜାଗୁ ପାତିଆ ବସିଯା ଗଲବନ୍ଦ୍ର, ଯୁକ୍ତକରେ ମନେ ମନେ ବଲିତେଛିଲ,
ଠାକୁର, ଆର ତ କିଛୁ ନାହିଁ ; ଏଇବାର ସେମନ କରିଯା ହୋକ ଆମାକେ
ନିଷ୍କତି ଦାଓ । ଆମାର ଛେଲେରା ନା ଖାଇଯା ମରିତେଛେ, ଆମାର ସ୍ଵାମୀ
ହୃଦିଚନ୍ଦ୍ର କଙ୍କାଲସାର ହିତେଛେ—

ଓରେ କେନୋ—ଓରେ ପଟଲି—

ଶୈଳ ଚମକିଯା ଉଠିଲ,—ଏ ସେ ତାହାର ଭାଣୁରେ କର୍ତ୍ତ୍ଵର ! ଜାନାଲାର
ଫାଁକ ଦିଯା ଦେଖିଲ, ତିନିଇ ବଟେ । ପାକା ଚଳ, କାଁଚା-ପାକା ଗୋଫ, ସେଇ
ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଙ୍ଗ ସୌମ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି । ଚିରକାଳଟି ସେମନଟି ଦେଖିଯା ଆସିଯାଇଁ, ଠିକ
ତାଇ । କୋନ ଅଙ୍ଗେ ଏତୁଟି ପରିବର୍ତନ ସଟେ ନାହିଁ । କାନାଇ ପଡ଼ା ଫେଲିଯା
ଛୁଟିଯା ଆସିଯା ପ୍ରଣାମ କରିଲ; ପଟଲ ଖେଳା ଛାଡ଼ିଯା ହାପାଇତେ
ହାପାଇତେ ଉପର୍ହିତ ହିଲ । ତାହାକେ ତିନି କୋଲେ ତୁଲିଯା ଲଇଲେନ ।

ରମେଶ ସବ ହିତେ ବାହିର ହଇଯା ପ୍ରଣାମ କରିଯା ପଦଧୂଲି ଗ୍ରହଣ କରିଲ ।

ଗିରୀଶ କହିଲେନ, ଏମନ ସମୟ, କୋଥାୟ ସାଓୟା ହବେ ?

ରମେଶ କୁଣ୍ଡିତ ଅମ୍ପଟ୍ସରେ ବଲିଲ, ଜେଲାୟ—

ଗିରୀଶ ଚକ୍ଷେର ପଲକେ ବାରଦ୍ଵେର ମତ ପ୍ରଜଳିତ ହଇଯା ଉଠିଲେନ—
ହତଭାଗା, ଲଞ୍ଛିଛାଡ଼ା, ତୁମି ଆମାର ଥାବେ ପରବେ, ଆର ଆମାରଇ ସଙ୍ଗେ
ମାମଳା କରବେ ? ତୋମାକେ ଏକ ସିକି ପଯସାର ବିଷୟ ଆଶୟ ଦେବ ନା—
ଦୂର ହାତ ଆମାର ବାଡ଼ି ଧେକେ ; ଏଥୁନି ଦୂର ହାତ—ଏକ ମିନିଟ ଦେବି ନଯ
—ଏକ କାପଡ଼େ ବେରିଯେ ଯାଓ—

ରମେଶ କଥା କହିଲ ନା, ମୁଖ ତୁଲିଲ ନା; ସେମନ ଛିଲ ତେମନି ବାହିର
ହଇଯା ଗେଲ । ଦାଦାକେ ସେ ସେମନ ଭକ୍ତିମାନ୍ୟ କରିତ, ତେମନି ଚିନିତ ।
ଏହିସବ ତିରଙ୍ଗାରେ ଅନ୍ତଃସାରଶୃଙ୍ଗତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିଯା ସେ ତଥନକାର
ମତ ମୁଖ ବୁଝିଯା ବାହିର ହଇଯା ଗେଲ ।

ତଥନ ଶୈଳ ଆସିଯା ଦୂର ହିତେ ଗଲାୟ ଅଁଚଳ ଦିଯା ପ୍ରଣାମ କରିଲ ।

ଗିରୀଶ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଯା ବଲିଲେନ, ଏସ, ଏସ, ମା ଏସ । ସେ ସବେ
ଉତ୍ତାପ ନାହିଁ, ଜାଲା ନାହିଁ—ବାହିର ହିତେ ପ୍ରବେଶ କରିଯା କୋନ ଲୋକେର

সাধ্য নাই যে, বলে এই মানুষটাই মৃহূর্তকাল পূর্বে ওরূপভাবে চৌঁকার
করিতেছিল !

গিরীশের নজরে কোনদিন কিছু পড়ে না ; কিন্তু আজ কেমন
করিয়া জানি না, তাহার দৃষ্টিশক্তি আশ্চর্যনেপুণ্য লাভ করিল। শৈলের
প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তোমার গায়ে গয়না দেখচি নে কেন
ছেটবোঁমা ?

শৈল অধোমুখে স্থির হইয়া রহিল।

গিরীশের কঠিন পুনরায় এক এক পর্দা চড়িতে লাগিল—ঐ হড়-
ভাগা শুয়ার বেচে খেয়েচে। গয়না কাব ? আমার। শকে আমি
জেলে দিয়ে তবে ছাড়ব, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাইশে মকদ্দমার দিন অপরাহ্নবেলায় হরিশ মুখ কালি করিয়া
হৃগলীর আদালত হইতে বাটী ফিরিয়া আসিলেন এবং ধড়াচূড়া না
ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

নয়নতারা কাঁদ-কাঁদ হইয়া সহস্র প্রশ্ন করিতে লাগিল ; থবর
পাইয়া সিদ্ধেশ্বরী ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন। কিন্তু হরিশ সেই যেপাশ
ফিরিয়া নৌর হইয়া রহিলেন, কেহই তাহার মুখ হইতে একটা
জবাবও বাহির করিতে পারিল না।

মকদ্দমায় যে হার হইয়াছে তাহাতে সংশয় নাই,—তুই জায়ে
নিরন্তর বুঝাইতে লাগিলেন—মকদ্দমায় হার-জিত আছেই—তা
ছাড়া এখনও হাইকোর্ট আছে, বিলাতে আপীল করা আছে—এরই
মধ্যে এমন করিয়া ভাঙিয়া পড়িবার কিছুমাত্র হেতু নেই।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই দুটি স্ত্রীলোকের যে আশা-ভরসা ছিল,
নিজে উকিল হইয়াও হরিশের তাহার কণামাত্রও দেখা গেল না।

সিদ্ধেশ্বরী আর সহ করিতে না পারিয়া হরিশের হাত ধরিয়া
বলিলেন, মেজঠাকুরপো, আমি বলচি, তোমাদের হার হবে না। যত
টাকা লাগে আমি দেব, তুমি হাইকোর্ট কর। আমি আশীর্বাদ করচি
তুমি জিতবেই।

এতক্ষণে হরিশ মুখ ফিরাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বৌঠান,

সে হবার জো নেই—সব শেষ হয়ে গেছে। হাইকোর্টই বল, আর বিলাতই বল—কোথাও কোন রাস্তা নেই। বিষয় সমস্তই দাদার নামে খরিদ ছিল। বিয়ে দিতে গিয়ে তিনি সর্বস্ব ছোটবৌমার নামে দানপত্র করে দিয়ে এসেছেন। রেজিস্ট্রি পর্যন্ত হয়ে গেছে। দেশের দিকে মুখ ফেরাবারও আর পথ নেই।

ঢাই জায়ে মুখোমুখি হইয়া পাথরের মূর্তির মত বসিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যার পর গিরীশ আদালত হইতে ফিরিয়া আসিলে যে কাণ্ড ঘটিল তাহা বর্ণনাতীত। কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মাদ বলিয়া লাঞ্ছনা করিতে কেহ আর বাকী রাখিল না।

গিরীশ কিন্তু সকলের বিরুদ্ধে ত্রুমাগত বুঝাইতে লাগিলেন যে, এছাড়া আর কোন রাস্তাই ছিল না। হতভাগা নজ্বার বোম্বেতে, ছোটবৌমার গয়নাগুলো বেচিয়া খাইয়াছে, আর একটু হইলেই বাড়ির ইটকাট পর্যন্ত বেচিয়া খাইত—দেশের বাড়ির অস্তিত্ব পর্যন্ত লুণ্ঠ হইয়া যাইত। তিনি সকল দিক বিশেষ বিবেচনা করিয়াই ভরাতুরি হইতে বংশকে নিষ্কৃতি দিয়া আসিয়াছেন।

শুধু সিদ্ধেখরী একধারে স্তুতি হইয়া বসিয়াছিলেন, ভালমন্দ কোন কথাই এতক্ষণ বলেন নাই। সবাই চলিয়া গেলে, তিনি উঠিয়া আসিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। চোখছুটিতে জল তখন টলটল করিতেছিল; ঢাই পায়ের উপর মাথা পাতিয়া পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আজ তুমি আমাকে মাপ কর। তোমাকে যার যা মুখে এলো—বলে গাল দিয়ে গেলবটে, কিন্তু তুমি যে তাদের সবাইয়ের চেয়ে কত বড়, সে-কথা আজ যেমন আমি বুঝেচি এমন কোনদিন নয়।

গিরীশ মহা খুশী হইয়া মাথা নাড়িয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, দেখলে, বড়বো, আমার সবদিকে নজর ধাকে কিনা! রমেশকালকের ছোড়া, সে আমার চোখে ধুলো দিয়ে আমার এত কষ্টের বিষয় নষ্টকরে দেবে! এমনি কায়দা বেঁধে দিয়ে এলুম যে, আর সেখানে বাছাধনের চালাকিটি চলবে না।—বলিয়া কি জানি নিজেরকোন হাসির কথায় নিজেই হোহো শব্দে হাসিয়া ঘরদ্বার পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।